# এই দাহ

গৌরকিশোর ঘোষ

কসমস্-এর বই

কসমো স্ক্রিপ্ট ॥ ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০:

প্রচ্ছদ : সন্তোষ গুপ্ত

প্রকাশকাল : জানুয়ারী ১৯৬১

প্রকাশিকা : তাপসী সেনগুপ্ত, ১১, নিতাই বাবু লেন, কলিকাতা-৭০০০১২
মুদ্রণ : শ্রীযুগল কিশোর রায়, শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস, ৫২এ, কৈলাস
বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬।

ত্রিবেণী টিস্যুর বন্ধুদের

এই লেখকের অন্যান্য বই :

- পশ্চিমবঙ্গ এক প্রমোদ তরণী হা হা
- সাগিনা মাহাতো
- লোকটা
- আমরা যেখানে
- নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি
- জল পড়ে পাতা নড়ে
- গড়িয়াহাট ব্রীজের উপর থেকে দু'জনে
- স্বর্গ যদি কোথাও থাকে
- ব্রজদার গুল্প-সমগ্র

মনোরমা তার দেহটা আমাকে দিয়েছিল। মনোরমা ভালবাসা দিয়েছিল তার স্বামীকে।

এখন রাত কত ?

যতই হোক না, জেনে এমন কী লাভ হবে তোমার ? তার চেয়ে লেখাটা শেষ করে ফেল গোলোক। সময় খুব বেশি নেই।

মনোরমার এত নিবিড় সান্নিধ্যে এসে, এত ঘনিষ্ঠ হয়েও আমি বুঝতে পারি নি, এক মুহূর্তের জন্যেও টের পাইনি, মনোরমা অকাতরে শুধু তার দেহটাই বিলিয়ে দিয়েছিল আমাকে। অথচ তার মন, তার প্রেম, কৃপণের ধনের মত সঞ্চয় করে রেখেছে তার স্বামীর জন্য। শুধু স্বামীর জন্য।

যখন টের পেলাম, তখন, তৎক্ষণাৎ কেমন যেন হীন মনে হল নিজেকে। যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি মনোরমার দেহে। নিজের দিকে নজর পড়ল আমার। ঠাণ্ডা চোখে মনোরমাকে দেখতে চেষ্টা করলাম। প্রচলিত আইন-কানুন, সংস্কার, পাপ-পুণ্য দিয়ে-গড়া পৃথিবীটা জ্বলজ্বল করে ভেসে উঠল আমার বুদ্ধি-বিবেচনায়। লজ্জায় ঘৃণায় অনুশোচনায় যেন আমার মাথাটা মাটিতে মিশিয়ে গেল। নিজেকে লুকিয়ে ফেললাম। পারলে নিজের কাছ থেকেও আড়াল করে রাখতাম !

এই আজ যেমন রেখেছ ? ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে ? টেবিলের ওপর ঐ শিশিটা কিসের গোলোক ? মাঝে মাঝে যেটাকে নাকের কাছে এনে ধরছ ? শুঁকছ ?

ওটা ক্লোরোফর্মের শিশি। বিকেলে ফার্মেসী থেকে কিনে এনেছি। বন্ধু এক ডাক্তারের সই জাল করে। শক্ত করে ছিপি আঁটা আছে। তাই গন্ধ নাকে ঢুকছে না। সময় আসুক তখন ওর ছিপি খুলব।

তখন ওটা কাজে লাগবে। ওতো মানুষ নয়, শিশি। যখন-তখন ওর সংযমের ছিপি আলগা হয় না।

মানুষ প্রবৃত্তির দাস। কথাটা নতুন নয়। বহুবার শুনেছে গোলোক। কিন্তু মানেটা আগে বোঝে নি। কারণ প্রবৃত্তি কাকে বলে জানত না। মনোরমাকে চেনবার আগে এসব নিয়ে মাথা ঘামায় নি। এমন কি মনোরমা আর সে যে একই বাসার বাসিন্দা গোলোক তাও জানত না। কোন দিকে চেয়ে তো দেখত না সে, নিজেকে নিয়েই মগ্ন ছিল।

এমনিতেই সে কুনো প্রকৃতির। তারপর যক্ষ্মায় ভুগে সে একেবারে গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। দেড় বছর হাসপাতালে ছিল। চিকিৎসার খরচ নিয়মিত জুগিয়েছেন তার দাদা। আরও টাকা পাঠিয়েছেন। এখনও পাঠান। নিয়মিত চিঠি লিখেছেন। এখনও লেখেন। গোলোককে কত উৎসাহ দিয়েছেন। এখনও দিচ্ছেন। গোলোক যেন হতাশ না হয়। যক্ষ্মাকে ভয় করার কিছুই নেই। ম্যালেরিয়ার চাইতেও যক্ষ্মার ধার কমে গেছে আজকাল।

কিন্তু দেড় বছরের মধ্যে সেই ভর্তি করাতে যা একদিন এসেছিলেন তার দাদা। আর না। না, গোলোক তার দাদাকে দোষ দেয় না। বরং মনে মনে হাসে। বিশেষ করে, তার খালাস হবার দিন যত এগিয়ে এসেছে, ততই তার দাদাকে তার স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হতে দেখেছে গোলোক। গোলোক যেন এখন দিন কতক কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে থাকে। এই ঘিঞ্জি কলকাতায়, যেখানে নির্মল বায়ু এক ফোঁটাও নেই, খালি ধোঁয়া আর আবিলতা, সেখানে এখন আসবার দরকার কি গোলোকের? বারবার তার দাদা চিঠি দিয়েছেন।

বরং গোলোক ছবি আঁকার কাজে এবার মনপ্রাণ ঢেলে দিক না। ভাল ভাল জায়গায় গিয়ে থাকুক, প্রাণভরে নিজের কাজ করুক গোলোক, এই তার দাদা চায়। টাকার জন্য একটুও যেন চিন্তা না করে গোলোক। ভাইকে একেবারে নর্ম্যাল করে তুলতে যত টাকা লাগে তার জন্য দাদা যে পরোয়া করেন না, সে-কথাও বারবার তাকে জানিয়েছেন দাদা। গোলোকের হাসি পেয়েছে। আরও অনেকের চিঠি পেত গোলোক। প্রথম প্রথম অনেকেই উদ্বেগ দেখাত। চিঠি লিখত। সহপাঠীরা লিখত। ঝর্ণাও। সে কাউকে জবাব দিত না।

হাসপাতাল থেকে গোলোকের দাদার বাসা মাত্র আড়াই ঘণ্টার পথ। সেই পথ পাড়ি মেরে চিঠি এসেছে, টাকা এসেছে। প্রয়োজনের বেশি টাকাই এসেছে গোলোকের দাদার কাছ থেকে। না চাইতেই এসেছে। কিন্তু দাদা আসে নি। বৌদিও না! গোলোক মনে মনে হেসেছে।

স্যানাটোরিয়ামে গেল না গোলোক। একখানা ঘর ভাড়া নিল টালিগঞ্জের খালের ধারে। বেশ নির্জন। বেশ খোলামেলা। তার ফ্ল্যাটটাই শুধু একখানা ঘরের। ছাতের ওপর ঘর। বেশ বড়।

দাদাকে লিখল, নিরিবিলিতে কাজ করতে চায়, তাই গোলোক এখানে বাসা নিয়েছে। দাদার বাসা থেকে দেড় ঘণ্টার পথ এখন। তাই আরও তাড়াতাড়ি জবাব এল। টাকা এল। কিছুমাত্র অসুবিধে হলেই যেন গোলোক লিখে জানায়। নর্ম্যাল লাইফে ফিরে আসছে গোলোক, এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু নেই তার দাদার কাছে।

হাসপাতালের ডাক্তারবাবুও এমনি আশ্বাস দিয়েছিলেন।—এই দেখুন মশাই এক্সরে-র ছবি, একেবারে ক্লিয়ার। এই স্পুটামের রিপোর্ট, দেখুন, অ্যাবসলিউট্‌লি ফ্রি। আর এই দেখুন ব্লাড রিপোর্ট, নেগেটিভ। একেবারে সেরে গেছেন মশাই। এখন যান, নর্ম্যাল লাইফ লীড্ করুন। নাউ চিয়ার আপ।

এই দেড় বছরে যা করেনি, গোলোক হুম করে তাই করে বসল। এতদিন সে খানিকটা উদাসীনভাবেই থেকেছে। উপযাচক হয়ে কোন প্রশ্নই করে নি। কিছু জানতে চায় নি। খুঁৎ খুঁৎ করে নি।

এই প্রথম আচমকা এক প্রশ্ন করে বসল, বিয়ে করতে পারব? বিয়ে! লোকটা যে কথা বলতে জানে ডাক্তারবাবু যেন এই প্রথম তার পরিচয় পেলেন। একটু হকচকিয়ে গেলেন। মেট্রন মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপলেন।

—বিয়ে? ও, অফকোর্স। তবে কেয়ার নিয়ে চলবেন। ডোণ্ট গো ফাস্ট। ডাক্তারবাবু আর মেট্রন হেসে উঠলেন।

মেট্রন জিজ্ঞাসা করলেন, কি, পাত্রী ঠিক হয়েছে নাকি!

গোলোক আর দ্বিতীয় কথা বলে নি সেদিন।

গোলোক তার ঘরে টাঙানো আয়নায় দাড়ি কামাচ্ছিল। কামাতে কামাতে কথাটা মনে পড়ায় হেসে ফেলল। একা, একেবারে একা থাকতে খারাপ লাগে না তো। গোলোক কিছুতেই মনে করতে পারল না, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় বিয়ের কথাটাই বা হঠাৎ কেন তুলেছিল। পাত্রী ঠিক আছে না কি? কার কথা মনে পড়েছিল তখন। ঝর্ণার? পাগল! ডোণ্ট গো ফাস্ট! হুঁ! এক পাও কোথাও নড়তে চায় না গোলোক।



আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, এই ঘরের বাইরেও জীবন আছে। আমি এখানে নিজের কাজ প্রথম থেকে নিজেই করতাম। নিজের কাজ মানে ছবি আঁকা নয়, ঘরকন্নার কাজ। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, সব। কুকার ছিল, রাঁধতাম। বাসন ধুতাম। ঘর সাফ করতাম। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, জামা-কাপড়-গেঞ্জি-আণ্ডারওয়্যার নিত্য সাবান দিয়ে কাচতাম। কি পরিষ্কার আমার

হাতের কাজ। কোথাও সামান্য একটু ময়লা, একটু নোংরাও লেগে থাকত না। একবারের কাজ দুবার করে করতাম। এ সব কাজ আমার খুব ভাল লাগত। এমন অনেকদিন গেছে বইয়ের একটা পাতাও পড়ি নি। রঙ তুলি ক্যানভাস বেরই করি নি বাক্স থেকে। শুধু ঘরকন্নার কাজ করেছি। সারাদিন শুধু ঝাড়-পোছ করেছি। পরিষ্কার করে রেখেছি ঘরখানাকে।

এতই যদি পরিষ্কার থাকার ঝোঁক তোমার, তবে নিজেকে সাফ রাখতে পারলে না কেন, গোলোক ?

ঘরের তো প্রাণ নেই। আসবাব, তৈজসের তো প্রাণ নেই, তাই হয়তো ওদের পরিষ্কার রাখা সহজ। কিম্বা আমার হয়তো সেই একচক্ষু হরিণের মত অবস্থা হয়েছিল। তাই সব নজরটা ঘর, আসবাব আর তৈজসের উপরই দিয়েছিলাম। একদণ্ড সুস্থির থাকতাম না তো। সব সময় কাজ নিয়ে থাকতাম। আমাকে সে সময় নর্ম্যাল হবার বাতিকে পেয়েছিল। আর এসব জিনিস-পত্রকে খুব ভালবাসতাম। এরা আমার ছোঁয়াচ এড়িয়ে চলত না। আমার স্পর্শ পেলে খুশী হত! ওরা আমার কাছে কাছে, আমাকে ঘিরে ঘিরে থাকত। দূরে দাঁড়িয়ে, তফাতে থেকে উৎসাহ দিত না।

নিজেকে নিয়েই মত্ত ছিলাম। আমার বন্ধু বলতেও আমি, শত্রু বলতেও আমি। যেন আমার বাইরে পৃথিবী নেই। আমার আগেও কিছু নেই, পরেও কিছু নেই। এমন কি আমার যে একদিন যক্ষ্মা হয়েছিল, হাসপাতালে ছিলাম, সেরে উঠে এই বাসা নিয়েছি, সে-সবও প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। এমন সময়, বাজারের পথে একদিন সত্যব্রতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সত্য আমার আর্ট কলেজের বন্ধু ছিল। তখন এমন দিনও গেছে, একই পেয়ালায় চুমুক দিয়ে দুজনে চা খেয়েছি। এতদিন পরে সেই সত্যর সঙ্গে দেখা।

হাসপাতালে ভর্তির দিন দাদার মুখ দেখেছিলাম, আর তার পরে এই সত্যর মুখ দেখলাম। এই আড়াই বছরে আর পরিচিত

কারও মুখ দেখি নি। ঐ মাঝে মাঝে যখন বাজারে আসতাম, তখনই যা মানুষের মুখ দেখতাম, আর কখনও-সখনও বারান্দায় এসে দাঁড়ালে, পথে খাল-ধারে, বাড়ীর ছাতে লোকের সাক্ষাৎ পেতাম। কিন্তু যেহেতু তারা আমার পরিচিত কেউ নয়, তাই তাদের অস্তিত্ব আমার কাছে কখনোই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

সত্যব্রতের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র বুঝলাম, আমি ছাড়াও জগৎ আছে। আমার একটা অতীত আছে। ইতিহাস আছে। পুরনো একটা চেনা জগৎ আছে। কথাটা মনে পড়তেই আমার মনের স্বস্তি চিড় খেল।

সত্যব্রতের হাতে অনেক কাজ। তবু সে অনেকক্ষণ গল্প করল। আমার শরীর ভাল হয়েছে, গায়ের রং ফর্সা হয়েছে, আগের চেয়ে অনেক মোটা হয়েছি, বলল। বারবার বলল, টি. বি. সম্পর্কে নানা ফল্‌স্ ধারণা আছে আমাদের, আজকাল টি. বি. কিওরেবল। একটু সাবধানে থাকতে হয়, এই যা। হ্যাঁ, আর জানাল ঝর্ণার বিয়ে হয়ে গেছে। লাভ ম্যারেজ। সত্যব্রত বলল, তোর পরে আমাদের বঙ্কিম ওকে পড়াত। তার সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে ঝর্ণা।

তুমিও তো ঝর্ণাকে পড়াতে গোলোক? বছর চারেক পড়িয়েছিলে না?

সত্যব্রত চলে গেল। এককালে খুব চা-খোর ছিল সত্যব্রত। এখন নাকি রেস্টুরেণ্টে আর চা খায় না। বড্ড আন্‌রিলায়েবল এই সব দোকানগুলো। কাপ-ডিশ ভাল করে ধোয় না। একজনের জার্মস্ আর একজনের মুখে ঢুকতে কতক্ষণ!

সেইদিন থেকে বাইরে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলাম আমি। একটা ঠিকে ঝি রাখলাম। ধীরে ধীরে ঘরকন্নার ভারও তার হাতে তুলে দিলাম। ঝিটাই আমার কাজকর্ম সব করে দিত। শেষে কোন কাজ আর নিজে করতাম না।

কেন না জোর পেতাম না। উৎসাহ পেতাম না। এতদিন যে কিসের ঝোঁকে এই ঘর, এই পরিবেশ আর আমি এক হয়ে

গিয়েছিলাম জানি না। এখন আমাদের সে-সম্পর্কে চিড় খেয়ে গেল।

সেদিন সত্যব্রতের সঙ্গে দেখা হবার পর গোলোক বাসায় ফিরেছিল অদ্ভুত একটা অস্বস্তি নিয়ে। কি কারণে যে এই অস্বস্তির উৎপত্তি হল, সে বুঝতে পারছিল না। সে কি তবে সত্যব্রতের সঙ্গে নিজের তুলনা করছিল? সত্যব্রত সাধারণ মানুষ। তার সঙ্গে দেখা হলে কত প্রসঙ্গ তোলে তার পরিচিত বন্ধুরা, কিন্তু কখনও এ-কথা কেউ তাকে বলবে কি, কি হে, তুমি তো বেশ নর্ম্যাল হয়ে গেছ। আর কি! এখন আর পাঁচজনের মতই জীবন কাটাতে পারবে।

একথার মানে কি গোলোক বোঝে না? এত সন্দেহ এরা তাকে করে কেন? এত উদ্বেগ তার প্রতি দেখায় কেন? গোলোকের স্পুটাম ফ্রি, চেস্ট ক্লিয়ার, ব্লাড রিপোর্ট নর্ম্যাল। গোলোক জানে এ সংবাদে সবাই খুশী হবে। কিন্তু সে খুশীর তলায় একটা সন্দেহও পুষে রাখবে। সত্যব্রত যতই বিশ্বাস করুক, গোলোক একেবারে সেরে গেছে, তবু যে-কাপে চা খাবে গোলোক, সত্য সেটাকে সন্দেহ করবে। সে-কাপে মুখ দিতে ভয় পাবে। সত্যব্রতকে লোকে ভাল বলবে, মন্দ বলবে, কিন্তু সে যে 'নর্ম্যাল', এ কথা তাকে কেউ শোনাবে না।

গোলোকের অস্বস্তি লাগতে লাগল। খাল ধারের জানালা খুলে দিল। মেঘে ঢাকা বিবর্ণ এক কলকাতার বিকেল তার চোখে পড়ল। যেন বরফ চাপা দেওয়া বাসি মাছের চোখ। তেতলার দূরত্ব থেকে সে দেখতে লাগল, দুটো লোক ঝগড়া করছে। একটা আধাবয়সী মেয়ে জলের ধারে উবু হয়ে বসে ঘোমটা টেনে প্রাকৃতিক কৃত্য সমাপন করছে। গোটা-চারেক দাঁড়কাক কিসের উপর জটলা করছে।

দৃষ্টিটা একটু অন্যদিকে ফেরাতেই দোতলা ফ্ল্যাটের বারান্দা তার চোখে পড়ল। সৌখিন লতা দিয়ে সাজানো বারান্দার ফালিটা

এই প্রথম তার নজরে পড়ল। সবুজ রঙের বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটি মেয়ে বসে আছে। ভাল স্বাস্থ্য, সুন্দর চেহারা, তবু যেন নিঃস্ব! গোলোকের তৎক্ষণাৎ মনে হল, এ-বুঝি যক্ষ্মা হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডেরই কোনও রোগী। এমন মুখ হাসপাতালে অনেক দেখেছে গোলোক। এখন ও বোধহয় নর্ম্যাল হয়ে ফিরে এসেছে। গোলোক মনে মনে হাসল! বিদ্রূপের হাসি। তারপর জানালাটা বন্ধ করে দিল।

এক বছর এই বাসায় কাটিয়ে দিল গোলোক। তবু এ-বাড়ীতে যে অন্য ভাড়াটে আছে, তা যেন এই প্রথম টের পেল।

বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। নাঃ, কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। কোথায় যেন ক্ষীণ একটা শুলুনি দেখা দিয়েছে। স্থির থাকতে দিচ্ছে না। অন্যদিন সে এতক্ষণ কত কাজ করে ফেলত। কিছু না করলেও চা বানাতে অন্তত বসত। আজ সে অসহায়ভাবে শুধু সরঞ্জামগুলোর দিকে চেয়ে রইল। র‍্যাকের উপর কেটলি, হিটার, কাপ, ডিশ, কৌটো ভরা চা, চিনি, জমানো দুধ থরে থরে সাজানো আছে।

কিন্তু ওগুলো আজ আর হাতছানি দিয়ে তুলতে পারল না তাকে। সে জানে উঠেও যখন সুখ পাবে না, তখন উঠে আর লাভ কি? প্রাণপণ চেষ্টায় সে চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু অস্বস্তি যার সত্তায় কুটকুট করে কামড় মারতে সুরু করেছে, সে চোখ বুজে থাকে কি করে?

গোলোক বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। পায়চারি করতে লাগল ঘরে। ঘরখানা বেশ বড়। অনায়াসে দুখানা ঘর হতে পারে। ছাতের ওপর ঘর। চারিদিক থেকে আলো আসে। অনায়াসে একটা ভাল স্টুডিও সে করতে পারে। কিন্তু তার কোন চেষ্টাই করে নি গোলোক। অথচ হাসপাতালে যাবার আগের জীবনে তার কত সাধ ছিল। এমনি একখানা ঘরে সুন্দর একটা স্টুডিও গড়ে তোলার। কিন্তু তখন তার দাদার এ বিষয়ে কোন আগ্রহ ছিল

না। বরং গোলোক জানে, এ-ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার দাদা নাকই সিঁটকাত। এখন, গোলোক যাতে নর্ম্যাল জীবন যাপন করতে পারে, তারই জন্য দাদা ছবি আঁকার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু গোলোক খুশী হত, তার দাদা যদি কেরানীগিরি করবার নির্দেশ দিত। গোলোক যে টালিগঞ্জে এসে ছবি আঁকতে চায়, একথা শুনে দাদা সত্যিকারের খুশী হয়েছে। আর তার সুন্দরী বউ স্বস্তি পেয়েছে, গোলোক একবারও সে-বাসার চৌকাঠ মাড়ায় নি দেখে। বৌদির পরামর্শেই দাদা নিয়মিত টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছে, গোলোক তা জানে। এটা তার দূরে থাকার মজুরি। গোলোকের এক এক সময় মনে হয়, এ-যেন ভয় দেখিয়ে টাকা নেওয়া। সুন্দর এক ব্ল্যাকমেলিং। যেন তার দাদা বৌদি জানে, যে মুহূর্তে তারা টাকা দেওয়া বন্ধ করবে, সেই মুহূর্তেই গোলোক গিয়ে হাজির হবে বাসায়। তাই সে সম্ভাবনা বন্ধ কর, পাঠাও যত টাকা সে চায়।

টাকার এখন আর অভাব নেই তার দাদার। ঠিকেদারীর কল্যাণে তার এখন অঢেল রোজগার। আয়কর দেয়, বাড়ী গাড়ী এবং জীবনের জন্য ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেয়, স্যানিটারী নিরাপত্তার জন্য কর্পোরেশনের ট্যাক্স দেয়, ডাক্তারের ফি-ও দেয়। তেমনি গোলোকের খাতেও একটা খরচ দাদার বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে।

তাই গোলোক জানে, চাইলেই এখন সে টাকা পায়। মন করলেই স্টুডিও খাড়া করে তুলতে পারে। কিন্তু কেন? কিসের জন্য?

গোলোকের মনে এক যন্ত্রণা তীব্রভাবে কামড় মারল। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সে একটানে জানালাটা আবার খুলে ফেলল। এখন খালধারে সে আর কাউকে দেখতে পেল না। কলহরত পুরুষ দুটো নেই, ঘোমটা-টানা সেই মেয়েলোকটা নেই, দাঁড়কাকের জটলাটাও নেই। আছে শুধু মেঘ-চাপা বিবর্ণ দিনের আলোটুকু। আর নিচে চেয়ে দেখল গোলোক, তেমনিভাবেই বসে আছে দোতলা ফ্ল্যাটের ফুল-লতায় সাজানো বারান্দায় সেই মহিলাটি।

আগে যে-জায়গায় যে-ভঙ্গিতে বসেছিল, এখনও সেইখানে তেমনি ভাবেই বসে আছে। একটুও নড়চড় হয় নি তার। যেন একটি মোমে গড়া মানুষের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি।

না, এতেও স্বস্তি পেল না। জানালাটা আবার বন্ধ করে দিতে যাবে, এমন সময় গোলোক দেখল, মেয়েটি নিস্পৃহ চোখ তুলে তার দিকে একবার চাইল। গোলোক কি জানি কেন জানালাটা বন্ধ করে দিতে গিয়েও দিল না। সে শুধু সরে এল।

ও কি অসুস্থ? প্রশ্নটা একবার গোলোকের মনে ভেসে উঠেই তৎক্ষণাৎ তলিয়ে গেল। গোলোক আর কিছু না ভেবে চা তৈরী করায় মন দিল।

আজকাল এমনিই হচ্ছে গোলোকের। যে নির্লিপ্তির মধ্যে সে হাসপাতালের দেড়টা বছর কাটিয়েছে, এই ঘরে একটা বছর কাটিয়েছে, সেই ভাবটা তার নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও সে মনকে শান্ত সুস্থির রাখতে পারছে না। কেবলই মনে হচ্ছে, তার উপর যেন অবিচার করা হয়েছে।

কে অবিচার করল সেটা স্পষ্ট নয়। হয়তো সবাই, হয়তো একজন কেউ। কাকে সে দোষ দেবে?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সত্যব্রতের মুখেই সে খবরটা পেয়েছে, ঝর্ণা বিয়ে করেছে। করুক বিয়ে। অন্যায় দাবী কেন করবে গোলোক। সেদিক থেকে ঝর্ণা অন্যায় কিছু করে নি। গোলোক নিজেই বরং সরে এসেছে। আজও ঝর্ণা গোলোকের ঠিকানা জানে না! যেদিন সে জানতে পেরেছিল, সাংঘাতিক ব্যাধি তাকে আক্রমণ করেছে, সেইদিনই গোলোক সরিয়ে ফেলেছে নিজেকে। সকলের আগে ঝর্ণাকেই জানিয়েছিল গোলোক। তারপর দাদাকে।

হাসপাতালে চিঠি লিখত ঝর্ণা। প্রথম দিকে গোলোক পড়ত। বড় যন্ত্রণা পেত সে। তারপর থেকে ঝর্ণার চিঠি রাখাই বন্ধ করে দিল। ঠিকানা কেটে ফেরৎ পাঠিয়ে দিত। কি লাভ শুধু শুধু হৃদয় খুঁড়ে বেদনা বাড়িয়ে। একদিন ঝর্ণার চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। গোলোক দুঃখ পেয়েছিল বৈ কি? কিন্তু তা অসহনীয় নয়।

সেই ঝর্ণা বিয়ে করেছে। বলবার কিছু নেই। কিন্তু ঝর্ণা সত্যিই কি ভালবেসে বিয়ে করেছে? গোলোকের খচখচানি এইখানে। যে ওকে পড়াত, তাকেই বিয়ে করেছে ঝর্ণা।

তুমিও ওকে পড়াতে গোলোক। তোমাকেও ঝর্ণা বিয়ে করতে চেয়েছিল। না, না, অত সোজা নয়। ঝর্ণাকে যা ভাবছ, অত লঘু মেয়ে সে নয়। আমি জানি ওকে। আমি ওকে ভাল করে চিনি।



ঝর্ণা তখন স্কুলের ছাত্রী। গোলোক বি. এ. পাস করে আর্ট কলেজে গিয়ে ঢুকেছে। গোলোকের দাদা তখনও এমন ফেঁপে ওঠেন নি। চাকরি-বাকরির চেষ্টা না করে আর্ট কলেজে ভর্তি হতে গোলোকের ওপর তিনি একটু অসন্তুষ্টই হয়েছিলেন। যাহোক একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিতে পরামর্শও দিয়েছিলেন। ছবি আঁকলে পেট চলবে না, এ কথা বার বার জানিয়েছিলেন। গোলোক গ্রাহ্য করে নি। সে তখন একটা টিউশানি খুঁজে বেড়াতে লাগল।

ঝর্ণার বাবা গোলোককে দেখেই পছন্দ করে ফেললেন। এক কথায় গোলোক পড়াতে লেগে গেল ঝর্ণাকে। ঝর্ণা তখন ক্লাস এইটের ছাত্রী। ফ্রক পরত, পিগটেল বিনুনি বাঁধত আর আইস্‌ক্রিম চুষতে ভালবাসত। আর গোলোক তখন বি. এ. পাস করেছে। ভ্যান-গগ পিকাসো হবার স্বপ্নে মজে আছে।

ঝর্ণার বুদ্ধিশুদ্ধি খারাপ ছিল না। তবে পড়াশুনায় মন দিত

না। গোলোকের বড় বিরক্তি লাগত। তার মনে হত, কটা টাকা পাবার জন্য অমূল্য সন্ধ্যেগুলো নষ্ট করে ফেলছে গোলোক। প্রথম বছরটায় কতবার সে বিরক্ত হয়েছিল, ঝর্ণার অমনোযোগিতায় ক্ষেপে উঠেছে। কতবার তার ইচ্ছে হয়েছে, এ-টিউশানি ছেড়ে দেবার। দু-একদিন এমন সঙ্কল্পও করেছে, এই শেষ, আজই শেষ করে দিয়ে আসবে। বলবে ঝর্ণার বাবাকে, অন্য লোক দেখুন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলে নি গোলোক। রোজকার মত হোম টাস্ক দিয়ে উপদেশ দিয়ে এসেছে, ভাল করে পড় ঝর্ণা, নইলে পাস করতে পারবে না। ঝর্ণা জবাব দিত, তাতে আপনারই নাম খারাপ হবে মাস্টারমশাই। গোলোকের ইচ্ছে হত, ঠাস করে একটি চড় মারবার। কিন্তু কোনদিন সে এসব ভাব প্রকাশ করে নি।

ক্লাস টেনে উঠেও ঝর্ণা ফ্রক পরছিল, পিগটেল বাঁধছিল। সে-সময়কার ঝর্ণার চেহারা কেমন ছিল গোলোক বলতে পারে না। মনে কোন ছাপ নেই তার।

সেই ঝর্ণাই গোলোকের মনে স্থায়ী ছাপ রাখল সেইদিন, যেদিন গোলোক ওকে প্রথম শাড়ি-পরা অবস্থায় দেখল। সেদিন বিকাল থেকে কালবৈশাখী ভেঙে পড়েছিল কলকাতায়। ছুটির পর কলেজেই ওরা আটকে গেল। তারপর ঝড়ের মাতামাতি শেষ হল, বৃষ্টির তেজ কমল। আর গোলোক যাবে না যাবে না করেও ভিজতে ভিজতে যখন ঝর্ণাদের বাড়ির দরজায় গিয়ে কড়া নাড়ল, তখন একটু রাতই হয়েছে।

তবু কড়া নাড়ল গোলোক। এসেছে যখন তখন হাজরেটা অন্তত দিয়ে যাক। খুট করে ভিতরে আলো জ্বলল, মুহূর্তে দরজা খুলল। গোলোকের চোখ ধাঁধিয়ে একটা বিদ্যুৎ যেন স্থির হয়ে দরজার ফ্রেমে আটকে গেল।

ঝর্ণাও একটু অবাক হয়েছিল। পরক্ষণেই খুশীতে ফেটে পড়ল।

—ওমা, মাস্টারমশাই! ভিজে নেয়ে উঠেছেন যে, বেশ হয়েছে।

উঠে আসুন, উঠে আসুন। এই বৃষ্টিতে কে আসতে বলেছে। এখন যদি অসুখ করে!

এ কার সামনে দাঁড়িয়ে আছে গোলোক? কে তাকে ভিতরে যেতে ডাকছে? ঝর্ণা? এ কোন্ ঝর্ণা?

শাড়ি-জড়ানো যে-মেয়েটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এতো ফ্রকের খোলসে ঢাকা গুটিপোকা নয়, এ যে পাখা-মেলা প্রজাপতি। গত ছু বছর ধরে সে একেই পড়িয়েছে নাকি? গোলোকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

ধীরে ধীরে ভিতরে উঠে এল। বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেল। অবাক চোখে দেখতে লাগল ঝর্ণাকে। ঝর্ণা গোলোকের ঐ তীব্র মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে প্রথমটা বিব্রত হয়ে পড়েছিল। পর মুহূর্তেই তার চোখে খুশীর ঝিলিক খেলে গেল। পুরুষকে বেকায়দায় ফেললে মেয়েদের চোখে হামেশা যে ঝিলিক খেলে। শুধু চোখে নয়, মুখের ডৌলে, ঠোঁটে, দেহের প্রতিটি রেখায় স্পষ্ট এক স্পর্ধিত অস্বীকার ফুটে উঠল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঝর্ণা যেন এতদিনকার অসাম্যের ব্যবধানকে কমিয়ে ফেলল।

ঝর্ণার চোখ, ঠোঁট, দেহের প্রতিটি অংশই যেন হেসে উঠতে লাগল। পুরুষ-খেলানো হাসি। ঝর্ণা আঁচল দিয়ে আঙুল জড়া'তে লাগল। ঠোঁট কামড়াল বার দুয়েক। কটাক্ষ করল। কিন্তু ঝর্ণাকে কিছুই করতে হল না। সব এক এক করে আপনা থেকেই ঘটতে লাগল। গোলোকের প্রতি রক্ত কণিকার কোষে কোষে প্রবল তীব্র আনকোরা নতুন এক অনুভূতির স্রোত শিরশির করে বইতে লাগল।

—আমাকে কেমন দেখতে লাগছে মাস্টারমশাই?

ঝর্ণার আচমকা প্রশ্নে চমকে উঠল গোলোক। সে দেখল তার এই ভাবান্তরে একটা দ্যুতি খেলে গেল ঝর্ণার চোখে।

গোলোক বলল, খুব সুন্দর।

ওর গলার স্বর কেঁপে গেল। আওয়াজটা ভাল করে বের হল না।

গলাটা সাফ করে গোলোক বলে উঠল, তোমাকে চেনাই যাচ্ছে না। যেন অন্য কেউ।

ঝর্ণা সঙ্গে সঙ্গে, যা, বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল।

বলল, দাঁড়ান, বাবাকে বলে দিচ্ছি।

ভয় পেয়ে গোলোকের মুখ শুকিয়ে গেল। ঝর্ণা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল।

বলল, কি ভীতু, কি ভীতু! বাবা নেই, মা নেই। মামা-বাড়ীতে গিয়ে সব আটকা পড়েছে। বাড়ীতে আমি একা।

বলেই ভিতরের দিকে ছুট দিল। আচমকা এক উত্তেজনার দমকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল গোলোক। একটি কথায় এত বিপর্যয়। একা! সে আর ঝর্ণা এতবড় বাড়ীটার ছাদের নিচে একা! পড়ার ঘরে এগিয়ে যাবে গোলোক, পারল না। বাড়ীর বাইরে চলে যাবে, পারল না! গোলোকের রক্তে আজ প্রথম ঝড় তুলল ঝর্ণা। পড়ার ঘর থেকে ঝর্ণা খানিক পরে ডাক দিল। গোলোক অতি কষ্টে এগিয়ে গেল। দেখল পড়ার টেবিলে হেলান দিয়ে ঝর্ণা দাঁড়িয়ে আছে। আর তার মুখে চোখে সেই খেলা শুরু হয়েছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে উঠেছিল গোলোকের।

কর্কশ, চেষ্টা-করে-আনা স্বরে গোলোক কোনমতে বলল, এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার?

অমনি ঝর্ণার ঠোঁটে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। যেন, এখন গোলোক যে জল চাইবে ঝর্ণা জানত।

—আনছি, বলে কটাক্ষ হেসে ঝর্ণা ভিতরে চলে গেল।

একটু পরেই কাচের গেলাসে জল নিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে জল নিতে গিয়ে ঝর্ণার আঙুলে ওর আঙুল ঠেকে গেল। ঝর্ণার

চোখ দুটো চিক চিক করে হেসে উঠল। যেন বলল, এই ভাবেই শুরু হয়। গোলোকের দেহ বিদ্যুৎশক্তির ঘা খেয়ে চমকে উঠল। গেলাসটা ভাল করে ধরবে এমন সময় দরজার কড়া সশব্দে নড়ে উঠল। গোলোকের হাত থেকে গেলাসটা ফস্কে মাটিতে পড়ে খানখান হয়ে ভেঙে গেল। গোলোকের বুকটা কেঁপে উঠল ভয়ে।

ঝর্ণা গোলোকের দিকে তিরস্কার করা দৃষ্টিতে একবার চাইল। পরক্ষণেই হাসতে হাসতে বলল, বেশ হয়েছে! যেমন অন্যমনস্ক। মা-রা এসেছে দাঁড়ান সব বলে দিচ্ছি।

ঝর্ণা দরজা খুলেই, ওমা, নতুনদি তুমিও এসেছ, বাঃ, বাঃ! বেশ হয়েছে। রাত্তিরে থাকবে তো?

নতুন দি বলল, আর কি পিসিমা, তোমা'র মেয়ে তো দিব্যি বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে।

—যা অসভ্য! বলে ঝর্ণা নতুনদির পিঠে এক কিল মারতেই সবাই জোরে হেসে উঠলেন।

নতুনদি বলল, আয়না দিয়ে ছাখ না বাঁদর। সত্যি তোকে যে আমার চাইতেও বড় দেখাচ্ছে রে।

ঝর্ণা খিলখিল করে হাসতে হাসতে নতুনদির হাত ধরে পড়ার ঘরে ঢুকে পড়ল।

বলল, সাবধানে পা ফেলিস নতুনদি, মাস্টারমশাই গেলাস ভেঙ্গে ফেলেছেন। মাস্টারমশাই আজ কিন্তু আমার ছুটি।

গোলোক আবার অবাক হয়ে গেল! দেখল এ একেবারে সেই আগের ঝর্ণা, চেনা ঝর্ণা, ছাত্রী ঝর্ণা। চোখের চাউনি আগের মতই সরল, তাতে লুকোনো কোন অর্থ নেই। তাতে অস্বস্তিকর কোন উপাদান নেই।

সত্য বলতে কি, গোলোক যেন দোটানায় পড়ে গেল। ঝর্ণা আসে, পড়ে, চলে যায়। তার চোখে, ঠোঁটে, মুখে সেই ঝিলিক আর দেখতে পায় না গোলোক। যে-মায়ার খেলা সেই সন্ধ্যায় ঝর্ণাকে নাবালিকাত্বের সীমান্ত থেকে এক টানে নারীত্বের দরজায় পৌঁছে দিয়েছিল, ঝর্ণার মধ্যে সেই মায়ার ছিটেফোঁটাও নেই এখন। এতে সুবিধে হয়েছে এই, ঝর্ণার সামনে সে আগের মতই সহজে, কর্তৃত্বের গদীতে এঁটে বসতে পারে। সেই রাত্রে লহমায় লহমায় ঝর্ণা যেমন দুজনের মধ্যেকার ব্যবধান কমিয়ে এনেছিল, এখন আবার সে ব্যবধান আগের মতই বেড়ে গেছে। এতে এক পরম স্বস্তি এই যে, গোলোক আবার তার মাস্টারির মুখোশ অনায়াসে এঁটে দিতে পেরেছে।

কিন্তু গোলোক এতে যে খুশী হয়েছে, একথা বললে মিথ্যে বলা হবে। এই নিস্তরঙ্গ ঝর্ণার সামনে এলে সে একটুও বিচলিত হয় না বটে, কিন্তু প্রতিদিন, দরজার কড়া নাড়বার পর কী এক প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকে। আবার সেই চমকটা দেবে না কি ঝর্ণা! না, প্রত্যহ যে দরজা খুলে দেয়, সে সাধারণ ঝর্ণা। তার চোখে কোন এক স্কুলের মেয়ে।

রোজ এমনিভাবে গোলোকের আশা ভঙ্গ হত। একটু বুঝি হতাশার কামড়ও খেত। তারপর আবার সে মনকে গুছিয়ে নিয়ে পড়াতে বসত। পড়িয়ে চলে যেত।

গোলোকের মন অস্থির হয়ে উঠত রাত্রির নিভৃতে। সেই ঝিলিক-মারা ঝর্ণার দেখা পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ত। তার কল্পনায়, স্বপ্নে সেই ঝর্ণার মূর্তিখানি একটু একটু করে তৈরী হয়ে উঠত। তখন গোলোক অপূর্ব এক সুখানুভূতির জোয়ারে ভাসত। এই সুখ পাওয়া ভাবটা কয়েকদিন ধরে আচ্ছন্ন করে রাখত গোলোককে। গোলোক রঙ তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করল। অনেক

এঁকে, অনেক ছিঁড়ে, অনেক যন্ত্রণায় ভুগে অনেকদিন পরে ছবিখানা শেষ পর্যন্ত শেষ করতে পেরেছিল। একখানা ছবিতেই গোলোক আর্টিস্ট মহলে বিখ্যাত হয়ে গেল। গোলোক তার নাম দিয়েছিল, 'কুঁড়ি থেকে ফুল।'

অনেকদিন ছবিখানা সে কাউকে দেখায় নি। শুধু নিজেই দেখত। বলতে গেলে সত্যব্রতই ওটাকে বের করে এনেছিল সকলের সামনে। ওদের কলেজের বার্ষিক প্রদর্শনীতে। অমন যে খুঁতখুঁতে প্রিন্সিপ্যাল, তাঁকেও প্রশংসাপত্র দিতে হয়েছিল। অবশ্য একথাও বলেছিলেন, সেন্টিমেণ্ট একটু বেশি আছে, তা থাক, এ-বয়সে ওটা একটু থাকা ভাল।

প্রদর্শনীতে ছবিখানা দেবার পর গোলোকের মন অনেকটা শান্ত হয়ে গেল। শুধু বার কয়েক ইচ্ছে হয়েছিল, ঝর্ণাকে একবার প্রদর্শনীতে নিয়ে যায়। কিন্তু বলতে ভরসা পায় নি। ছবি-টবি ঝর্ণার মাথায় ঢুকবে না।

সহপাঠীদের অনেকে অনেক আজেবাজে ইঙ্গিতও করত। জানতে চাইত, এই ফুলটি কে? রক্তমাংসের কেউ, না কল্পনা? গোলোক সে-সবে কান দিত না। এই সময় সে ছবি আঁকায় মন ডুবিয়ে দিয়েছিল।

সেই ছবিখানা এখন কোথায় আছে গোলোক? ঐ কালো ট্রাঙ্কে না?

হ্যাঁ। ঐ কালো ট্রাঙ্কেই সব ঠাসা আছে। দাদার গাড়ী এসে একদিন সব পৌঁছে দিয়ে গেছে। কিন্তু আমি খুলি নি। কিছুই বের করি নি। কি লাভ?

গোলোক দেখল, খোলা জানালা দিয়ে জলের ছিটে আসছে। কখন বৃষ্টি শুরু হল? সে জানালাটা বন্ধ করে দিতে উঠল। কেন, কে জানে দৃষ্টি পড়ল দোতলায়। সেই বাহারি বারান্দায় আলো জ্বলছে। কেউ নেই। পাশের জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখা

যাচ্ছে। একটি পুরুষ খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা গায়ের চাদর। মেয়েটি খাটের ধারিতে বসে পা নাচাচ্ছে। আর হাতের ভঙ্গিতে আপত্তি জানাচ্ছে। পুরুষটি সস্নেহে এগিয়ে এল। আদর করে মেয়েটির গায়ে চাদরটি জড়িয়ে দিল। মেয়েটি খুব বাধ্য। চাদরটি গায়ে জড়িয়ে চুপ করে বসে রইল। তাকে একটু ক্লান্ত, একটু বিষণ্ণ দেখাচ্ছে; সেই পুরুষটিকে আবার দেখা গেল। এবার দু হাতে দুটো গেলাস। গেলাসে দুধ না কি ভাল বুঝতে পারল না গোলোক। শুধু দেখল, দুজনে আবার কথা কাটাকাটি হচ্ছে। পুরুষটি একটি গেলাস মেয়েটিকে দিতে চাইছে। মেয়েটি কিছুতেই নেবে না। খুকিদের মত ঠেলে ঠেলে পুরুষের হাতটা সরিয়ে দিচ্ছে। পুরুষটা একটুও রাগছে না, একটুও বিরক্ত হচ্ছে না। বারবার সে স্নেহভরে অনুরোধ করছে বলে মনে হল। হঠাৎ পুরুষটা কি যেন বলল, মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর গেলাসটা হাতে নিল। পুরুষটি তার পাশে এসে বসল। তারও হাতে একটা গেলাস। দুজনে পাশাপাশি বসে চুমুক দিতে লাগল গেলাসে।

ওরা খুব সুখী। গোলোক মনে মনে বলল। তারপরই দেখে, সর্বনাশ, বৃষ্টির একটু একটু ছাঁটে তার জামাটা বুকের কাছে ভিজে গেছে! জানালা বন্ধ করেই সে তাড়াতাড়ি করে জামা ছাড়তে গেল।

ওরা কত সুখী! বিছানায় শুয়ে রাত্রির গভীর অন্ধকারে সারা দেহ ডুবিয়ে গোলোক মনে মনে বলে উঠল, সুখী পরিবার।

পারিবারিক স্বপ্নের ছবি আঁকা গোলোক ছেড়ে দিয়েছে।

সুখ পাওয়া।

পিছনে ছুটে লাভ নেই, সে-জ্ঞানটা তার আছে। নিজের

গোলোক রঙ

কোথায়, তার চেয়ে ভাল আর কে জানে? না, স্বপ্ন দেখার বৃথা চেষ্টা সে করে না।

কিন্তু দোতলা ফ্ল্যাটের যে মেয়েটিকে বিকেলে তার যক্ষ্মা হাসপাতালের রোগী বলে মনে হয়েছিল, সন্ধ্যায় দেখল সেও পারিবারিক জীব ! স্বামীর (নিশ্চয়ই ও-লোকটা তার স্বামী ) সান্নিধ্যে আসামাত্র কী অদ্ভুত পরিবর্তন হয়ে গেল মেয়েটার। কেমন আশ্চর্যভাবে সজীব হয়ে উঠল। তবে কি, গোলোকেরও এমন পরিবর্তন হত, যদি সেও পরিবারভুক্ত হত ? তার দাদা, ঝর্ণা, সবাই পরিবারের সামিল হয়ে গেছে। ঝর্ণাকে নিয়ে সেও তো এতদিন পরিবার বাঁধতে পারত !

ঝর্ণা না তোমাকে ভালবাসত গোলোক ?

বাসত বৈ কি ? সে-কথা আমি এখনও বিশ্বাস করি। সত্যব্রত বলল বটে ঝর্ণা বঙ্কিমকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। এটা একেবারে বাজে কথা। বাজে কথা। বঙ্কিমকে বিয়ে করার অনেক কারণ থাকতে পারে। তার পিছনে ভালবাসার তাগিদ নেই, এ আমি এখনও বিশ্বাস করি।

এই বিশ্বাসের জন্যই তুমি হাসপাতাল ছাড়ার সময় ডাক্তারবাবুকে আচমকা প্রশ্ন করেছিলে, বিয়ে করতে পারব ? তাই না ? তোমার অবচেতন মনে ঝর্ণার কথাই কি মনে পড়েছিল, গোলোক ?

অ্যাঁ ? হ্যাঁ, তা হতে পারে। ঠিক জানি নে। তবে এটা জানি, ঝর্ণাকে আমি নিজে থেকেই বিয়ে করতাম না। সে চাইলেও, না। আমি জানি, অসম্ভবের পিছনে ছুটে লাভ নেই।

এটা নিতান্ত বাজে কথা হল নাকি, গোলোক ? কোন্‌টা অসম্ভব ছিল তোমার কাছে ? ঝর্ণাকে বিয়ে করা, না বিয়ে না-করা ? বিয়ে করাই যদি অসম্ভব বলে ভেবেছিলে, তবে সেই চারুলতাকেই বা, বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন ? মনোরমাকে আর তোমাকে, চারুলতা যদি এক বিছানায় শুয়ে থাকতে না দেখত, তবে কি বিয়েটা হত না বলতে চাও। তবে ?

সে তো অনেক পরের কথা। তখন আমার পরিবর্তন ঘটে গেছে।

মনোরমার দেহের আস্বাদ পেয়েছি তখন। এটাও ধরে ফেলেছি মনোরমা শুধু তার দেহটাই বিলিয়ে গেছে এতদিন। মন দেয় নি, ভালবাসা দেয় নি। সেটা সঞ্চয় করে রেখেছিল তার স্বামীর জন্য। সে-জানায় যে কত যন্ত্রণা, এক আমিই টের পেয়েছি। মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম সে-ক্ষতের উপশম করতে। চারুলতা হাতের কাছে ছিল, সম্ভবতঃ সে আমাকে ভালও বেসেছিল, তাই চারুলতাকে অবলম্বন করে তাকে ভালবেসে সে-জ্বালা জুড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু মনোরমা তাতেও বাদ সাধল। এখন রাত কত?

বেশি নেই গোলোক, বেশি নেই। বেশি সময় তোমার হাতে নেই। শিশি শুঁকেও লাভ নেই এখন। আগে লেখাটা শেষ কর, তারপরে ওটাকে কাজে লাগিও। এলোমেলো ভাবে এগিয়ো না। ধাপে ধাপে এগোও।

হ্যাঁ, সেই ভাল। আগে তবে ঝর্ণার কথাই বলে নিই।

ঝর্ণা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ভর্তি হল। গোলোকেরও প্রায় কলেজ ছাড়বার সময় হল। এর মধ্যে, এই দীর্ঘ দুটো বছরের মধ্যে, ঝর্ণাকে নিয়ে তেমন কোন অস্বস্তিতে আর পড়তে হয় নি গোলোকের। সেই একদিন, কিছু সময়ের জন্য, ঝর্ণার নারীত্ব তার নাবালক অবয়বে ভর করে আবার তা মিলিয়ে গিয়েছিল। এই দুবছরে আর একদিনও তা ফুটে ওঠে নি। অন্তত গোলোকের চোখে। মাঝে মাঝে গোলোকের মনে হয়, সে বুঝি ভুলই দেখেছে। কিন্তু ছবিখানা? সেখানা তো ভুল নয়। তা যে জলজ্যান্ত এখনও আছে গোলোকের কাছে। তবে কি সবটাই গোলোকের কল্পনা। কুঁড়ি কুঁড়িই ছিল, কখনও ফুল হয়ে ফোটেনি। গোলোক কুঁড়িকেই ফুল বলে ভুল করেছে।

ছবিখানা আঁকার পর থেকেই গোলোকের অস্বস্তির অনেক

উপশম হয়েছিল। তবে তার মন আগে ঝর্ণা সম্পর্কে যত উদাসীন ছিল, এখন তার কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করল। ঝর্ণার সান্নিধ্যে এলে সে যেন আনন্দ পায়। যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভালই লাগে গোলোকের।

সেদিন সন্ধ্যায় যেতেই ঝর্ণা বলল, মাস্টারমশাই, কাল আমার ছুটি কিন্তু। কাল আমরা থাকব না।

কথাটা শুনে গোলোক চমকে উঠল। কেন? কি করবে কাল?

—পিকনিক করব আমরা। দক্ষিণেশ্বরে যাব। সারাদিন থাকব তো। কখন ফিরব ঠিক নেই। বাবা তাই বলছিলেন, মাস্টার-মশাইকে বলে দিস।

তাও ভাল। আশ্বস্ত হল গোলোক।

—আর কে থাকবে?

—অনেক অনেক। নতুনদিরা আসবে। আমার বন্ধুরা আসবে। বাবা যেন আরও কাকে কাকে বলেছেন।

—শুধু আমিই বুঝি বাদ। ফস্ করে গোলোকের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল।

—বাঃ, তা কেন? লজ্জায় ঝর্ণার মুখ লাল হয়ে উঠল। বোকা-বোকা মুখ করে বলল, আপনি বাদ যাবেন কেন, আপনিও যাবেন।

একটু থেমে ঝর্ণা বলল, সত্যি আপনি যাবেন, মাস্টারমশাই?

—তোমার বাবা আমাকে নেমন্তন্নই করলেন না, যাই কি করে?

—এই তো আমি নেমন্তন্ন করছি।

—তুমি নেমন্তন্ন করার কে?

—বারে! মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝর্ণা বলল, আমারই তো ব্যাপার।

এবার গোলোক আশ্চর্য হল।

—আমার জন্মদিন যে। সেইজন্যই তো পিকনিক। আমি বলছি, আপনাকে যেতে হবে।

গোলোক এবার একটু দুঃখ পেল। এত ব্যাপার, আর সে কিছুই

জানে না। গোলোকের মুখে বোধহয় এই দুঃখটার ছায়া ভেসে উঠেছিল। ঝর্ণা একটু অপ্রস্তুতই হল।

খপ্‌ করে গোলোকের হাতখানা চেপে ধরে বলল, সত্যিই অন্যায় হয়ে গেছে মাস্টারমশাই, আমি মাপ চাইছি।

ঝর্ণার অন্তরঙ্গতায় গোলোকের অভিমান বেড়ে গেল! বলল, অন্যায় আর কি হয়েছে। আমি তোমাদের নিজের লোক তো, নই, যে—

গোলোকের কথা শেষ না হতেই ঝর্ণা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

—আরে আরে ছি ছি। কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?

ঝর্ণা টেবিলে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। পিঠের উপর মস্ত একটা বেণী লুটিয়ে পড়েছে। ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে পিঠের খানিকটা নরম ত্বক দেখা যাচ্ছে। দুটো হাতের উপর টেবিলের ল্যাম্পের উজ্জ্বলতা ঝরে পড়ছে। গোলোকের রক্তে কেমন একটা শিরশিরানি শুরু হল। বুকটা দুরদুর করতে লাগল। সেই দুবছর আগে একদিন যে প্রগল্‌ভ ফুলের সামনেটা দেখেছিল, এখন তারই ওপিঠটা যেন গোলোকের নজরে পড়ল। সেই অস্বস্তি আবার আক্রমণ করল গোলোককে। সে কি করছে বোঝবার আগেই ঝর্ণার মাথাটা তুলে ধরল। আশ্চর্য, ঝর্ণার চোখ দিয়ে জলের রেখা গড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও গোলোকের মনে হল সে-চোখের কটাক্ষে হাসি যেন ঝিলিক মেরে উঠল। চোখের ভাষায় স্পষ্ট হয়ে যেন ফুটল: এবার? কেমন জব্দ!

ঝর্ণা বলল, যাবেন তো, মাস্টারমশাই?

কান্নার লেশমাত্র পরিচয় ঝর্ণার স্বরে নেই।

গোলোকের হাসি পেল। বলল, আচ্ছা যাব।

অমনি ঝর্ণার চোখ মুখ হাসিতে ভরে উঠল। মুহূর্তে গোলোক দেখল ফুল আবার ফুটে উঠেছে। চোখের হাসি, ঠোঁটের হাসি বলছে, আমি জানতাম।

গোলোক সেদিন আর বেশিক্ষণ বসে থাকতে পারল না। ঠিকানা নিয়ে সোজা সে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সেদিনের সব কথা গোলোকের মনে আছে। কিছুই সে ভোলে নি। দরজার কাছে ঝর্ণা এসে দাঁড়িয়েছিল।

বলেছিল, মাস্টারমশাই, যাবেন তো কাল?

গোলোক বলেছিল, যাব।

ঝর্ণা এই সংক্ষিপ্ত জবাব বিশ্বাস করে নি। বলেছিল, না আমার গা ছুঁয়ে বলুন।

গোলোক হেসে ফেলেছিল। বলেছিল, মুখের কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার গা ছুঁয়ে কথা দিলে সে-কথা রাখব, তাই বা বিশ্বাস করবে কেন?

—হ্যাঁ করব। আমার গা ছুঁয়ে কথা দিলে সে-কথা আপনি ফেলতে পারবেন না।

ঝর্ণার চোখ-মুখ সাপুড়ের কৌতুকে হেসে উঠেছিল। গোলোকের মনে হল এ-ঝর্ণা নিতান্ত সরল ঝর্ণা নয়। তার চোখে, তার মুখে যে-হাসি ফুটে উঠেছে, সে যেন বলতে চায়, বলছে, আমি জানি, তোমার দুর্বলতা কোথায়, অনেকদিন আগেই জেনেছি।

গোলোকের প্রবল ইচ্ছে হয়েছিল, ঝর্ণার হাত দুটো চেপে ধরে। কিন্তু কিছুতেই পারল না।

মাথায় হাত রেখে বলল, যাব। সত্যি যাব।

তারপর সে আর ঝর্ণার দিকে চাইতে পারে নি। সোজা বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়।

অদ্ভুত ভাল লাগছিল গোলোকের পথে পথে ঘুরতে। রাত বাড়তে লাগল। ট্রাম-বাসের সংখ্যা কমে এল। গোলোক একটুও ভ্রূক্ষেপ করে নি। নিঃসঙ্গ হয়ে নির্জন পথে সে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে কিসের নেশায় এমন বুঁদ হয়ে গেছে, সেদিন বুঝতে পারে নি। এই আকাশ, আকাশে অজস্র তারা, রাস্তার সারি দেওয়া

আলো, ছায়া-ছায়া বাড়ীগুলো সব তার ভাল লেগেছিল। বেলফুল-ওয়ালার চিৎকার থেমে গেল। কুলপী বরফ বাড়ী ফিরে গেল। গাড়ির ভিড় কমে এল। এলোমেলো হাওয়া রাস্তার ধূলো, ছেঁড়া কাগজ, শালপাতার ঠোঙা নিয়ে লোফালুফি খেলল। সবই দেখল গোলোক। তারপর অনেক রাতে বাসায় ফিরল। ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল বিছানায়। আনন্দের নেশা তাকে ঘুমুতে দিল না।

গোলোকের মনে আছে সে রাতে তার এক বিন্দুও ঘুম হয় নি।

আর মনে আছে পরের দিনের কথাও। খুঁজে পেতে বাগান-বাড়ীটা বের করতে তার সময় লেগেছিল। একে সে বেশ দেরি করেই রওনা দিয়েছিল, তার উপর বাড়ী খুঁজতে আরও দেরি!

গোলোককে দেখামাত্র ছুটে এসেছিল ঝর্ণা। গাছ-কোমর বেঁধে শাড়িটা পরেছে। যৌবনের অস্তিত্ব ফুটে বেরুচ্ছে। গোড়ালি বেরিয়ে পড়েছে। হাঁফাচ্ছে ঝর্ণা। পরিশ্রমে লাল হয়ে গেছে। ঘাম জমেছে।

—এত দেরি করলেন যে!

ঝর্ণার চকচকে চোখদুটো কপট অভিমানে ভারি হয়ে এসেছিল। গোলোক হাসল।

বলল, ভুল ঠিকানা বলে দিয়েছিলে—

মুখের কথা শেষ হতে দিল না ঝর্ণা।

ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বলে উঠল, ইস, আমার অমন ভুল হয় না মশাই, নিজেই ভুলে গিয়েছিলেন। সত্যি মাস্টারমশাই, আপনি খুব ভাল। না এলে যে কি কষ্ট হত আমার!

—এই ঝর্ণা!

দূর থেকে কে একটা মেয়ে ওকে ডাকল। গোলোক বিরক্ত হয়েছিল মেয়েটার ওপর।

—এই ঝর্ণা! খেলা ফেলে কতক্ষণ বসে থাকব?

আবার ওর ডাক এল। ঝর্ণা নিরুপায় হয়ে গোলোকের দিকে চাইল।

গোলোক হাসতে হাসতে বলল, যাও ঝর্ণা, তোমার জন্য খেলা আটকে আছে।

ঝর্ণার মুখেও হাসি ফুটে উঠল।

—খেলা দেখবেন, মাস্টারমশাই ?

গোলোকের ইচ্ছে হল, বলে, হ্যাঁ। কিন্তু বলল, না, তোমাদের দঙ্গলে গিয়ে আমি কি করব ?

—তবে ভেতরে যান। ব্যস্ত ঝর্ণা তাড়াতাড়ি জবাব দিল, ঘরে বাবারা আছেন।

বলেই ঝর্ণা ছুট দিয়েছিল। গোলোকের এটা খুব ভাল লাগল না। সে চায় নি ঝর্ণা এত শীঘ্র চলে যাক। সে ভেবেছিল, ঝর্ণা তার জবাব শুনে খেলতে আর যাবে না। তার কাছেই থাকবে। তাই সে খেলা দেখতে চায় নি। ঝর্ণা চলে যেতেই গোলোকের মনটা যেন ফাঁকা হয়ে উঠেছিল। গোলোক একটা অন্য প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিল। সেটা পূরণ না হতে ও একটু দমে গেল। এখানে আসাটা তার কাছে নিরর্থক বলে মনে হল। বিরক্ত হল নিজের উপর।

দূরে মেয়েরা কী খেলা করছে লাফিয়ে লাফিয়ে কে জানে। ঝর্ণাকে পেয়ে ওদের হল্লা বেড়ে উঠল। গোলোকের প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল ওখানে যায়। কিন্তু কিছুতেই সে সেদিকে পা বাড়াতে পারল না। অনিচ্ছুকভাবে ঘরের দিকেই এগিয়ে গেল।

সেখানে ঝর্ণার বাবা বন্ধুবান্ধব পরিচিত লোক নিয়ে আড্ডা জমিয়েছিলেন। বিলাতী কায়দায় পোশাক-পরা সমবয়সী গোটাকতক স্মার্ট যুবককে দেখল গোলোক। বিশেষ পছন্দ করল না।

ঝর্ণার বাবা গোলোককে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

—আরে, এস এস গোলোকবাবু। বেটার লেট দ্যান নেভার। আমরা ভাবছিলাম তুমি বুঝি আর এলে না। ঝর্ণার সঙ্গে দেখা হয়েছে ? ও তো অস্থির হয়ে উঠেছে।

তিনি সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন গোলোককে। ঝর্ণার টিউটার। আর্ট ইস্কুলের কৃতী ছাত্র।

একটি যুবক বলে উঠল, আই সি, ইউ আর গোলোক মজুমদার! হ্যাট আর্টিস্ট! নাউ আই আণ্ডারস্টাণ্ড!

গোলোক তার কথার ধরনে ঘাবড়ে গেল। অন্য সকলেও চোখে জিজ্ঞাসা ভরে তার দিকে চেয়ে রইল।

যুবকটি এবার বাংলায় বলল, গোলোকবাবু আমাদের ঝর্ণার একটি চমৎকার পোরট্রেট এঁকেছেন মামা। বছর দুয়েক আগে ওঁদের কলেজের একজিবিশনে সেটা দেখানো হয়েছিল। হ্যাটস্ এ ওয়াণ্ডারফুল পেন্টিং। অলমোস্ট এ মাস্টারপীস্!

—সে কি! কই, আমরা তো কেউ জানি নে! কি হে গোলোক-বাবু, ঝর্ণার বাবা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন গোলোকের দিকে। সত্যি নাকি? তা, এত বড় খবরটা তুমি চেপে গেছ। ভাগ্যি মহেন্দ্র বলল!

মহেন্দ্র বলল, একজিবিশনে ছবিখানা দেখে তো আমি অবাক। ঝর্ণার ছবি এখানে কোত্থেকে এল। কি যেন নামটা? হ্যাঁ, 'কুঁড়ি থেকে ফুল'। আর্টিস্টের নাম দেখলাম গোলোক মজুমদার। চিনতে পারলাম না। তাই ভেবেছিলাম, তবে বোধহয় অন্য কারো পোরট্রেট হবে। এখন বুঝলাম সেটা আমাদের ঝর্ণারই।

ঝর্ণাও খবর পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছিল।

—সত্যি মাস্টারমশাই? আমার ছবি এঁকে একজিবিশনে দিয়েছেন? সত্যি? কবে আঁকলেন? জানি নে তো। কখনও তো বলেন নি?

দেখতে দেখতে অভিমানে মুখে অন্ধকার নেমে এল ঝর্ণার। যান আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

তারপর ঝর্ণা আবার মিশে গেল তার বন্ধুদের ভিড়ে।

কয়েকজনকে ডেকে শোনাল, জানিস মাস্টারমশাই আমার ছবি এঁকেছেন। একজিবিশনে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপরই সে খেলায় মত্ত হয়ে গেল। দৌড় ঝাঁপ, হৈ হল্লা করল সারাদিন! আবার যেন সে স্কুলের মেয়েটি হয়ে গেল। একবার এলোও না গোলোকের কাছে। খোঁজখবরও নিল না।

সারাটা দিন খুব খারাপ কাটল গোলোকের। এই ভিড়ে সে বড় বেমানান হয়ে পড়েছে। আর যারা এসেছে সবাই সবার পরিচিত, আত্মীয়, বন্ধু! পরস্পর আলাপ করছে, গল্প করছে, তর্ক করছে। সেই শুধু আলাদা হয়ে পড়েছে। একেবারে একা। না এলেই পারতো গোলোক। কেন যে মরতে এল এখানে।

কিন্তু না আসার ক্ষমতা ছিল না বলেই তো সে এসেছে। কাল যে-ঝর্ণা নিমন্ত্রণ করেছিল, আজকে এই চপল, খুকি-খুকি ঝর্ণার মধ্যে গোলোক তাকে খুঁজে পেল না। কালকের সেই ঝর্ণার অনুরোধ না রাখা তার পক্ষে শক্ত ছিল।

ঝর্ণার সেই কি-রকম দাদা, মহেন্দ্র, এক ফাঁকে তার সঙ্গে আর্টের কথা কপ্‌চে নিল। ফ্রান্স, গোগ্যাঁ, মাতিস, ইম্‌প্রেশানিজম্‌, কিউবিজম্‌ কত কি যে বলে গেল গোলোকের কাছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। বিরক্তি বোধ করছিল গোলোক। কোন মতে তার হাত এড়িয়ে বাইরে চলে গেল। গাছের ছায়ায় গোল হয়ে বসে ঝর্ণারা কি যেন খেলছে, দূরে দাঁড়িয়ে সে তাই দেখতে লাগল। একটা আশ্চর্য জিনিস গোলোক লক্ষ্য করল। অনেক মেয়েই তো খেলছে একসঙ্গে। ঘুরছে, ফিরছে, উঠছে, বসছে, কিন্তু গোলোকের দৃষ্টিতে তারা কেউ ফুটে উঠছে না। কিন্তু ঝর্ণা সামান্য একটু নড়ে বসামাত্র গোলোকের নজর ঝপ্‌ করে তার উপর পড়ছে। কখনও কখনও আশ্চর্য ভাল লাগছে তাকে।

কিছুক্ষণ পরে গঙ্গার ধারে বাঁধানো ঘাটের ছায়ায় গিয়ে বসল গোলোক। ওপারে বেলুড় মঠ। চকচকে দিন, জোর হাওয়া, লোক-জন, নৌকা, ব্রিজ, ট্রেন, সব মিলিয়ে গোলোকের মনে সুন্দর

মনোরম এক ভাবের সৃষ্টি হল। তার যেন কারও ওপর আর অভিযোগ নেই। এক প্রশান্ত প্রসন্নতায় যেন তা ভরে গেছে।

মেয়েরা হৈ হৈ করে ছুটে এল। মুহূর্তের মধ্যে গোলোকের প্রশান্তি বিদায় নিল। সব চান করতে এসেছে। জলে গিয়ে লাফ ঝাঁপ দিচ্ছে কেউ, কেউ সন্তর্পণে গিয়ে ডুব দিচ্ছে। জল ছিটোচ্ছে, খিলখিল করে হাসছে। হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায় ঝর্ণার আঁচল উড়ে গেল। ভিজে ব্লাউজ ভেদ করে তার দেহ-রেখা ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গোলোক অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল। ঝর্ণার দেহের গড়ন দেখে গোলোকের চোখে তৎক্ষণাৎ প্রতিমার বুক ভেসে উঠল। হঠাৎ ওর ইচ্ছে হল আরেকবার দেখে। এবার চাইতেই ঝর্ণার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। জলকেলির উত্তেজনায়, খুশীতে স্ফটিকের মত চকচক করছে ঝর্ণার চোখদুটো। গোলোককে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল ঝর্ণা।

একবার বলল, কি সুন্দর জল মাস্টারমশাই, নামুন না।

পরক্ষণেই বুঝি গোলোকের অস্তিত্বই ভুলে গেল। প্রবল উত্তেজনায় ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল জলে।

ঝর্ণা গোলোককে চমকে দিল পরের পরের দিন। পিকনিকের পরদিন সে পড়াতে যায় নি। ভাল লাগছিল না তার। মনটা বেঁকে বসল। কিছুতেই ঝর্ণাদের বাড়ীতে যেতে রাজী হল না। সারাক্ষণ তার মনে হয়েছে, কি যেন সে পায় নি, কি যেন হারিয়েছে। মনে কোন রকম জোর পাচ্ছিল না, তাই কোন কাজে মন দিতে পারে নি সেদিন।

পরদিন, ঝর্ণাদের বাসায় ঢোকামাত্র, ঝর্ণা বেরিয়ে এল।

উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করল, শরীর খারাপ হয় নি তো মাস্টার-মশাই ?

সংক্ষেপে জবাব দিয়ে পড়াতে বসল গোলোক।

পড়ানো শেষ হলে সে উঠতে যাবে অমনি ঝর্ণা বলে বসল, আপনি আমার উপর রাগ করেছেন মাস্টারমশাই, না ?

প্রশ্নের ধরনেই গোলোক চমকে উঠেছিল। দেখল ঝর্ণা কেমন শান্ত সংযত হয়ে গেছে।

গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ঝর্ণা বলল, আমি জানি আপনি রাগ করেছেন। আমারই অন্যায় হয়েছে মাস্টারমশাই, সেদিন আপনাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছি। বিশ্বাস করুন, আমারও খারাপ লেগেছে। আপনার কাছে যাওয়ার জন্য আমার খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল।

গোলোক বোকার মত চেয়ে রইল ঝর্ণার দিকে। বলছে কি ঝর্ণা!

—হ্যাঁ মাস্টারমশাই। কিন্তু পাছে ওরা ঠাট্টা করে, তাই যাই নি। আপনি আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন, তাতেই নতুনদি কি সব বলছিল।

—আমি তোমার দিকে চেয়েছিলাম, তোমাকে কে বললে ?

ঝর্ণা বেশ জোর দিয়েই বলল, আমি সব লক্ষ্য করেছি। ঝর্ণার স্বর সঙ্গে সঙ্গে খাদে নেমে এল। বলল, অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি।

এই একটিমাত্র কথায় গোলোকের মনে যেন তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। সে ধরা পড়ে গেছে ঝর্ণার কাছে। ঝর্ণা দিনের পর দিন তাকে লক্ষ্য করে গেছে! একেবারে বোকা বনে গেল গোলোক।

—নতুনদিও দেখেছে।

ঝর্ণার কথায় চমকে উঠল গোলোক। দেখল ঝর্ণার সংযতভাব বদলাতে লেগেছে। চোখের কোণে দুষ্টু হাসি এসে উঁকি মারতে শুরু করেছে।

—নতুনদি আমার খুব পিছনে লাগে জানেন। আচ্ছা মাস্টারমশাই, আমার যে-ছবিটা আপনি এঁকেছেন, সেটা কি মন থেকে এঁকেছেন ?

গোলোক বলল, কেন বল তো ?

—নতুনদি বলছিল, দেখিস্, তোর মাস্টারমশাই তোকে—

ঝর্ণা আর বলতে পারল না। ঝপ্ করে ওর মুখ রাঙা হয়ে গেল।

কি বলেছে ঝর্ণার নতুনদি? গোলোকের বুক দুর দুর করতে লাগল।

—কি বলেছে, তোমার নতুনদি?

—যাঃ, নতুনদিটা বড় অসভ্য!

হাসতে লাগল ঝর্ণা। ওর চোখে-মুখে অনেক কথা ফুটে উঠতে লাগল।

গোলোক সেদিন আর ঝর্ণার দিকে চাইতে পারে নি। তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল বাসায়। সেই রাতটায় আবার একটা ঘোর এসেছিল গোলোকের। রেশটা অনেকদিন ছিল। স্মৃতিটা এখনও ঝাপসা হয়ে যায় নি।

ঝর্ণা বলেছিল, ছবিটা কবে দেখাবেন মাস্টারমশাই?

ঝর্ণার পীড়াপীড়িতে ছবিটা এনে দেখাল গোলোক। বাড়িসুদ্ধ লোকের সে কি হৈ চৈ সেদিন। ঝর্ণার বাবা-মার মুখে গোলোকের প্রশংসা তো আর ধরে না।

ঝর্ণার বাবা বললেন, গোলোকবাবু তুমি একটা জিনিয়াস। ওয়াণ্ডারফুল হয়েছে। বলছ বটে এটা দুবছর আগের ঝর্ণা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এটা আজকালের ঝর্ণা।

ঝর্ণারও খুশীর অন্ত ছিল না। বলেছিল, এটা আর দেব না কিন্তু।

সেদিন থেকেই ঝর্ণার একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল গোলোক। তার চপলতা একেবারে কমে গেল। এখনও হাসে ঝর্ণা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ছোটে তার চোখ থেকে। কিন্তু তবুও সে-সবের চেহারা যেন অন্য রকম। মাঝে মাঝে কি হয় ঝর্ণার, পড়তে পড়তে থেমে যায় হঠাৎ, গোলোকের দিকে কেমন অদ্ভুতভাবে চেয়ে থাকে। আবার কোন কোন দিন একবারও মুখ তুলে চায় না।

ক্ষণে ক্ষণে তার গাল রক্তিম হয়ে ওঠে। গলার স্বর গাঢ় হয়, মৃদু স্বরে কথা বলতে থাকে ঝর্ণা। নখ খুঁটতে থাকে। এমনি মুহূর্তগুলোতে গোলোকের গা শিরশির করতে থাকে। খুব ভাল লাগে, মনে একটা নেশা নেশা ভাব জাগে। সেও চেয়ে থাকে ঝর্ণার দিকে। ঝর্ণার ঠোঁটে একফালি হাসি ফুটে ওঠে। রহস্যময় হাসি।

হঠাৎ চট করে উঠে পড়ে ঝর্ণা। অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, এখন আমি যাই।

ঝর্ণা তার সামনে থেকে উঠে যাওয়ামাত্র প্রবল এক সুখকর উত্তেজনার জোয়ার যেন গোলোককে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যায়, তার ঠিক নেই। এই সময় ঝর্ণার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছেটা তার প্রবল হয়ে উঠেছিল। নানা জায়গায় ঝর্ণাকে নিয়ে যাচ্ছে গোলোক, বেড়াচ্ছে দুজনে, এমন স্বপ্ন সে হামেশাই দেখেছে। যে-রাতে সে ঐ ধরণের স্বপ্ন দেখতো, তার পরদিনটা অদ্ভুত ভাল মেজাজে থাকতো।

গোলোক স্বপ্নেও ভাবে নি, এমন একটা সুযোগ সে অযাচিত-ভাবে পাবে।

পূজোর সময় ঝর্ণারা দেশের বাড়ীতে যায়। সেবার আর সবাই চলে গেলেও ঝর্ণা কলকাতায় থেকে গেল বাবার সঙ্গে যাবে বলে। একদিন গোলোককে ঝর্ণার বাবাই বললেন, আমি তো মোটে সময় পাচ্ছি নে গোলোকবাবু, ভাবলাম বাড়ি যাবার আগে মেয়েটাকে নিয়ে ঘুরব-ফিরব, তা এই সময় যত কাজ পড়ল। তুমি এক কাজ কর না, ওকে শহরটা একটু দেখাও না। মেয়েটা দিন দিন যত বড় হচ্ছে, ততই যেন মিইয়ে যাচ্ছে।

সেইদিন বিকালেই ওরা বেরুলো। ভেবেছিল সিনেমায় যাবে। কিন্তু গঙ্গার ধারে গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এত ভাল লাগল যে সিনেমার বন্ধ ঘরে গিয়ে ঢুকতে চাইল না ওরা। স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল ওরা। গঙ্গার পাড়ে ধপ করে বসে পড়ল ঝর্ণা। গোলোককেও বসতে বলেছিল। সামনে একটা বিরাট জাহাজ। ঝর্ণার কথার স্রোতোমুখ যেন খুলে গেল। অনর্গল বকতে থাকল। আহা বলুক, বলুক। গোলোকের মন বলে উঠল। গোধূলির আলো ঝর্ণার মুখখানাকে অনেক সজীব করে তুলেছে। অনেকটা আপন মনে কথা বলে চলেছে। এই জাহাজ কোত্থেকে এল? কদ্দিন এখানে থাকবে? এখান থেকে কোথায় যাবে? কত মাল ধরে? ভেতরে গিয়ে দেখতে দেবে কিনা?

গোলোক শুধু 'হুঁ' 'হাঁ' করে যাচ্ছিল।

হঠাৎ ঝর্ণা প্রশ্ন করে বসল, আচ্ছা মাস্টারমশাই, এই জাহাজটার ছবি, আপনি বাসায় গিয়ে আঁকতে পারবেন? অবিকল যেমন দেখছেন, তেমনি?

গোলোক হাসল। ছেলেমানুষিতে পেয়েছে ঝর্ণাকে।

বলল, অমন হুট করে কি আঁকা যায়। আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব লক্ষ্য করতে হবে, তবে তো!

—বেশ, ভাল করে লক্ষ্য করলেন, তারপর?

—তারপর ধ্যান করতে হবে। ধ্যানে এই জাহাজখানাকে অবিকল মনের মধ্যে এনে ফেলতে হবে। তারপর দেখবে ছবি আপনিই আঁকা হয়ে যাচ্ছে।

ঝর্ণা এই জবাব শুনে অবাক হয়ে চেয়ে রইল গোলোকের মুখের দিকে।

বলল, তবে তো নতুনদি বাজে কথা বলে নি।

গোলোক ঝর্ণার কথা ভালভাবে বুঝতে পারল না।

ঝর্ণার স্বর গাঢ় হয়ে এল। বলল, নতুনদি বলেছিল, তোর চেহারাখানা মাস্টারমশাইয়ের মনে আঁকা হয়ে আছে।

গোলোকের দেহে চাঞ্চল্য দেখা দিল। ঝর্ণার মুখের দিকে চেয়ে সে বলল, তোমার নতুনদি সত্যি কথাই বলেছেন।

গোলোকের স্বর ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ঠেকল। ঝর্ণার চোখে যেন স্বপ্ন নেমে এসেছে। মনের খুশী উপছে পড়ছে চোখ-মুখের ভিতর দিয়ে।

মৃদু আধা-আধা নরম স্বরে ঝর্ণা বলল, আমি তো ছবি আঁকতে জানি নে, তবে আমার মনে আপনার ছবি আঁকা আছে কেন মাস্টার-মশাই! আপনার কথা মনে পড়লেই আপনার ছবিটা ভেসে ওঠে।

ঝর্ণার স্বরে সামান্য হয়তো উত্তেজনা আছে, কিন্তু ছলনা নেই। এক গভীর সত্য জেনে ফেলেছে যেন সে। তাই তার প্রকাশে কপটতা নেই।

ঝর্ণা সরলভাবেই প্রশ্ন করল, কেন মাস্টারমশাই?

গোলোক ঝর্ণার হাত দুটো ধরে ফেলল। বলল, আমি তোমাকে, তোমাকে ভালবাসি ঝর্ণা, তাই তোমার ছবি আমার মনে আঁকা আছে। তোমাকে আমি খুব ভালবাসি ঝর্ণা।

গোলোক ঝর্ণার হাতে মৃদু চাপ দিল। ঝর্ণার হাত বুঝি ঘেমে উঠতে লাগল। অসহায়ভাবে কাঁপতে লাগল। চোখ দুটো অতল-স্পর্শী হয়ে উঠল।

ঝর্ণা ফিসফিস করে বলল, বাড়ি চলুন, মাস্টারমশাই।

গোলোক ফিসফিস করে মিনতি করল, আর একটু বস, আরেকটু বস ঝর্ণা, এখনই উঠো না।

ঝর্ণার চোখ দুটো এই মিনতি শুনে হেসে উঠল। যেন অভয় দিল। যেন বলল, না, উঠব না এখন। ভয় পেয়ো না।

সূর্য ডুবে গেছে। জাহাজগুলোর গায়ে, হাওড়ার পুলে, আলোর মালা জ্বলে উঠেছে। অন্ধকার নেমে পড়েছে পথে। হাওয়া উঠেছে। গোলোক ঝর্ণার হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে বসে আছে। এক মধুর আবেশে তলিয়ে গেছে গোলোক। তাদের সামনে এখন জাহাজ নেই, গঙ্গা নেই, পিছনে কেল্লা নেই, কিছু নেই। ওরাই দুজন শুধু আছে।

—গোলোক, এই গোলোক।

অনেক দূর থেকে ডাকটা যেন ভেসে আসছে। কে গোলোক? আমি, আমাকে কেউ ডাকছে?

—গোলোক, এই গোলোক। কি রে, বুঁদ হয়ে গেছিস যে!

গোলোক এতক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে পেল। দেখল সত্যব্রত। আঁকার সরঞ্জাম ঘাড়ে করে কোত্থেকে যেন ফিরছে। দেখল, ঝর্ণা অপ্রস্তুত হয়ে বসে আছে একটু দূরে। গোলোক নিজেও একটু বিব্রত হল। কিন্তু মুহূর্তেই সামলে নিল।

বলল, ঝর্ণা, এ হল সত্যব্রত। আমার সহপাঠী। বন্ধু। নাম-করা আঁকিয়ে। আর এ হচ্ছে আমার ছাত্রী, ঝর্ণা—

—কুঁড়ি থেকে ফুল, হাসতে হাসতে বলল সত্যব্রত। এখন তো পুরোপুরি ফুল, মাফ করবেন ম্যাডাম। আপনি ঐ নামেই প্রকাশিত আমাদের দোষ কি?

সত্যব্রতের কথার ধরনে ঝর্ণা খুব মজা পেল। ওর অপ্রস্তুতভাব কেটে গেল। হাসতে লাগল মুখে আঁচল চাপা দিয়ে।

—তা বাবা, এত রাত্রে এখানে কি করছ দুজনে? পিছনে গুণ্ডা লেগে যেতে পারে। চল, শহরের ভেতরে চল।

সত্যব্রতের কথায় ঝর্ণা ভয় পেয়ে ফ্যাকাশে মেরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল সে।

ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, চলুন, মাস্টারমশাই চলুন।

গোলোক সত্যব্রতের এই পাকামিতে বিলক্ষণ চটে গেল। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে উঠল। ঝর্ণা এত ভয় পেয়েছে যে, কিছুক্ষণ গোলোকের গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপ্টে লেপ্টেই হাঁটতে থাকল। আর এই প্রথম গোলোক ঝর্ণার নিকট সান্নিধ্যে এল। ঝর্ণাকে জড়িয়ে ধরতে, কাছে টানতে প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল গোলোকের। কিন্তু সঙ্গে যে সত্যব্রত রয়েছে।

আউট্রাম ঘাট থেকে চৌরঙ্গীতে আসতে কতটুকু সময়ই বা লাগে। কিন্তু তার মধ্যেই গোলোক দেখল, সত্যব্রত দিব্যি ভাব

জমিয়ে নিয়েছে ঝর্ণার সঙ্গে। সত্যের সংস্পর্শে আসামাত্র ঝর্ণা যেন অনেক চোখা হয়ে উঠল। মুখর হয়ে উঠল। গোলোক যে পিছনে পিছনে আসছে, সে-কথা যেন ওরা ভুলেই গেছে। ঝর্ণার হাত ধরে কেমন অনায়াসে চৌরঙ্গীটা পার করে দিল সত্য। চা খাওয়াতে গিয়ে ঢুকলো মণিকোতে। ঢুকেই দেখে বঙ্কিম বসে আছে। সত্যব্রত বলল, এই যে বঙ্কিম, আয় তোর সঙ্গে আলাপ করে দিই। এ হচ্ছে ঝর্ণা, আমাদের বন্ধু গোলোকের ছাত্রী।

'আমাদের বন্ধু' কথাটা গোলোকের কানে লাগল। বঙ্কিমের ভাবে মনে হল, ঝর্ণাকে দেখে সে যেন একটু বিস্মিত হয়েছে।

ফ্যাকাশে মুখখানা রুমাল দিয়ে মুছে বঙ্কিম বলল, আপনাকে এর আগেও আমি দেখেছি।

ঝর্ণা অবাক হয়ে গেল। বঙ্কিম সিগারেটে একটা টান মেরে বলল, অবাক হবার কিছু নেই। আমার মত অনেকেই দেখেছে আপনাকে। অবিশ্যি গোলোকের ছবিতে। সে-ছবি যারা দেখেছে, কেউই আপনাকে ভুলবে না। ওয়াণ্ডারফুল!

ঝর্ণা একটু লজ্জা পেয়েছিল। তা সত্বেও সে চিকচিক করে উঠল খুশীতে। চকচকে চোখে একবার সত্যব্রত, একবার বঙ্কিমের মুখে চাইতে লাগল। গোলোকের মনে হল, সে আর পাত্তা পাচ্ছে না কারোর কাছে।

বঙ্কিম বলল, দেখুন, আমি আঁকতে পারি নে। তার জন্য খেদ ছিল না মনে। আজ আফসোস হচ্ছে। ঈর্ষা হচ্ছে গোলোকের উপর।

ঝর্ণার যেন বাড়ী যাবার তাড়া নেই। গোলোক ভাবল, বাঃ বেশ। মশগুল হয়ে শুনছে ওদের কথা। এদিকে রাত হচ্ছে সে-খেয়াল নেই।

গোলোক তাড়া দিল, ঝর্ণা, আর না। আটটা বেজে গেল। তোমার বাবা হয়তো ভাববেন।

এতক্ষণ পরে ঝর্ণা যেন বাস্তবে ফিরে এল।

—কী সর্বনাশ! তাই নাকি? চলুন, চলুন।

ঝর্ণা এমন তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ল যে তার ধাক্কা লেগে জলের গেলাসটা বঙ্কিমের জামা-কাপড় খানিকটা ভিজিয়ে দিল। ঝর্ণা অপ্রস্তুত। বঙ্কিম হাসতে হাসতে জল ঝেড়ে ফেলল।

বলল, ভাল কথা, গোলোক, তারপরে তুমি আর এঁর কোন ছবি আঁক নি?

গোলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না।

চ্চাক্ করে জিভের শব্দ করে বঙ্কিম বলল, কি আফসোস! সে ছবিটা কোথায় রেখেছ?

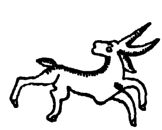
গোলোক ঝর্ণার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওদের বাসায়!

বঙ্কিম ঝর্ণাকে বলল, তাহলে আপনাদের বাসায় একদিন যাব, ছবিটা দেখতে। অবশ্য গোলোকের যদি আপত্তি না থাকে।

ঝর্ণা বলল, বারে, এতে মাস্টারমশাইয়ের আপত্তি হবে কেন?

বঙ্কিম বলল, সে আপনি বুঝবেন না। বঙ্কিম সত্যব্রতের মুখের দিকে চাইল। তারপর দুজনে হেসে উঠল। ঝর্ণার মুখও সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়ল।

সত্যব্রত বলল, আমি যদি তুই হতাম গোলোক, এ-সুযোগ ছাড়তাম না। এর মধ্যে অনেক ছবি এঁকে ফেলতাম ঝর্ণার।



সত্যব্রত নেহাৎ খারাপ পরামর্শ দেয় নি সেদিন। যদিও গোলোক সে-পরামর্শ রাখে নি। তখন গুরুত্ব দেয় নি সে-কথার।

এটা তোমার কাছে আশ্চর্য লাগে না গোলোক? শিল্পী হয়েও তুমি এত বড় একটা সুযোগ কাজে লাগাও নি। সত্যব্রতও তো ঝর্ণার ছবি এঁকেছে। আর তুমি পারতে না।

না, আমি পারতাম না। সত্যব্রতের চোখে ঝর্ণা তো শুধু ছিল একটা মডেল। আমার কাছে ঝর্ণা ছিল ভালবাসার ধন। ঝর্ণাকে মডেল করে তো ছবি আঁকতে হয়নি আমাকে। আমার কল্পনাতেই ঝর্ণা মূর্ত হয়েছিল। সত্যব্রতের পরিশ্রমই সার হয়েছে। একটা পোরট্রেটও জীবন্ত হ'য়ে ওঠে নি। সে-কথা ঝর্ণা বলেছে। সত্যব্রতও বলেছে।

তুমি ছবিটা ঝর্ণাকে দিয়ে আবার চেয়ে এনেছিলে কেন গোলোক? আনলে যদি আর ফেরৎ দিলে না কেন?

সত্যি বলতে কি কেমন যেন ঈর্ষা হয়েছিল আমার। কারণ, দেখতে পাচ্ছিলাম, ক্রমশঃ ঝর্ণার কাছে আমার চাইতেও আমার আঁকা ছবি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল। তখন আমি খুবই মনস্তাপে ভুগছিলাম। সত্যব্রত তখন ঝর্ণার বাড়ীতে গিয়ে ঘটা করে তার ছবি আঁকতে বসত, তখন লক্ষ্য করতাম, সে সত্যব্রতকেও গুরুত্ব দিচ্ছে। ঝর্ণা আমার আসনে আর কাউকে বসাচ্ছে, এ-চিন্তাও আমার কাছে অসহ্য ঠেকত। সে যে কী দাহ, কি করে বোঝাব! আমি জানতাম, ঝর্ণার কাছে সত্যব্রত ছিল শুধু একজন শিল্পী। আমি জানতাম, ঝর্ণা আমাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। কিন্তু তবুও, সে কেন অন্য পুরুষকে সঙ্গ দেবে? যে সন্ধ্যায় ঝর্ণার সঙ্গ পাবার জন্য আমি উন্মাদের মত ছুটে যেতাম, গিয়ে দেখতাম ঝর্ণার চারপাশে অন্য লোকের অধিকারের গণ্ডি পড়ে গেছে। ঝর্ণার বাবা বৈঠকখানার প্রশস্ত ঘরে আরাম কেদারায় বসে চুরুট ফুঁকছেন, টুলের উপর পাকা মডেলের মত ঝর্ণা বসে আছে। সত্যব্রত ছবি আঁকছে। আমার অস্তিত্ব যেন শূন্য মানে নেমে গেছে। সত্যব্রত শিল্পী হিসাবে আমার চেয়ে অনেক বেশি সিরিয়স, সেটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সে কেন আমার অধিকারে হাত বাড়াবে?

আর এর জন্য দায়ী যদি কেউ থাকে তো আমার ঐ ছবিখানা।

ঐ ছবিখানাই তো সবাইকে ঝর্ণার ঠিকানা জানিয়ে দিয়েছে। রক্ত-মাংসের ঝর্ণাকে আর্টের ঝর্ণায় পরিণত করেছে। তাই সব অনর্থের মূল সেই ছবিখানাকে একজিবিশনে দেব বলে ঝর্ণাদের বাসা থেকে নিয়ে এসেছিলাম। ইচ্ছে ছিল ওটাকে নষ্ট করে দেব। কিন্তু পারি নি। এখনও আমার কাছে রয়েছে সেটা। ঐ কালো ট্রাঙ্কে বন্দী হয়ে।

গোলোকের যে পরিবর্তন হচ্ছে, সে যে অহরহ অশান্তিতে ভুগছে, এটা ঝর্ণার নজর এড়ায় নি।

একদিন পড়তে বসে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে আপনার মাস্টারমশাই ?

গোলোকের মুখখানা হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। বলল, কেন ?

ঝর্ণা কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে গোলোকের দিকে চেয়ে রইল। তার চোখের কোণায় বেদনার ছায়া খেলে গেল। বলল, বলুন না কি হয়েছে ?

গোলোক ঠাণ্ডা গলায় বলল, আজেবাজে কথা না বলে টাস্কটা শেষ কর।

ঝর্ণার চোখ দুটো টলটল করে উঠল। পরক্ষণেই সামলে নিল। বলল, বেশ। তারপর মাথা নীচু করে পড়তে লাগল। গোলোকও একটু ব্যথা পেল মনে।

একটু পরে গোলোক গলাটা মোলায়েম করে বলল, কি বলছিলে তখন ?

ঝর্ণা অভিমানে কথা বলতে পারল না। মাথা নীচু করে পড়তে লাগল।

গোলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, তোমার বাবাকে মাস্টার ঠিক করতে বলো ঝর্ণা।

ঝর্ণা এবার চমকে উঠল। মুখখানা মুহূর্তে শুকিয়ে গেল।

বলল, কেন, কেন মাস্টারমশাই!

বড় বড় চোখ করে গোলোকের মুখের দিকে দমবন্ধ করে হাঁ করে চেয়ে রইল ঝর্ণা। যেন গোলোক এক্ষুণি ফাঁসির হুকুম দেবে।

গোলোক বলল, এখন তোমার কলেজের পড়া। ভাল মাস্টার রাখা উচিত। আমার দ্বারা একাজ হবে না।

—না না না না না। ঝর্ণা কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। আমি কি কোন অপরাধ করেছি? বলুন, আপনার পায়ে পড়ি। কোন অন্যায় করেছি আমি?

গোলোক দেখল, ঝর্ণা এক মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে। ভুগছে যে তার পরিচয় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ঝর্ণার মুখে-চোখে, তার প্রতিটি অভিব্যক্তিতে। এই চোখে একদিন বিদ্যুতের ছটা দেখেছিলাম, গোলোক ভাবল। আজ সেখানে শুধু মেঘ। এই ঠোঁটে একদিন লাস্য ফুটেছিল। আজ সেখানে কাতরতা। এই চোখই, এই ঠোঁটই, এই মুখখানাই একদিন স্বপ্নের মায়াজালে ঢাকা পড়েছিল। আরেকদিন প্রশান্তিতে ভরে উঠেছিল। সেই ঝর্ণা আর এই ঝর্ণা! না, এক ঝর্ণা নয়, প্রত্যেক সময়ে সে নতুন নতুন ঝর্ণাকে রূপ নিতে দেখেছে! এই যে যে-ঝর্ণা এখন তার সামনে বসে তার ব্যবহারে কষ্ট পাচ্ছে, কাঁদছে, ভয় পেয়েছে, এ-ঝর্ণাও নতুন সৃষ্টি। এতো কখনও তাকে ভোগায় নি। আগের কোন ঝর্ণা জ্ঞানতই হোক কি অজ্ঞানতই হোক, যদি তাকে যন্ত্রণা দিয়েই থাকে, যদি তার দাহের কারণ হয়েই থাকে, তার জন্য এই ঝর্ণাকে সাজা দেওয়া কেন। গোলোকের মন বিষণ্ণ হয়ে এল। ঝর্ণা ব্যথা পাচ্ছে। পাচ্ছে তারই কারণে এই কথা ভেবে গোলোকও কষ্ট পেতে লাগল। ঝর্ণার চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্য প্রবল ইচ্ছে হল। কিন্তু সব বারের মত এবারও সে ইচ্ছেমত কাজটা আর করে উঠতে পারল না। কোথা থেকে যে এই প্রবল বাধাটা আসে, তাকে পঙ্গু করে দেয়, বুঝতে পারে না গোলোক।

গোলোক সস্নেহে বলে উঠল, ঠাট্টা করছিলাম ঝর্ণা।

ঝর্ণা সঙ্গে সঙ্গে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, সত্যি! সত্যি যাবেন না তো? আমার গা ছুঁয়ে বলুন।

আজ আর গোলোক সঙ্কোচ করল না। ঝর্ণার হাত দুটো টেনে নিল। বলল, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি যাব না।

ঝর্ণা বলল, উঃ কি সাংঘাতিক লোক আপনি। আমি কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়েছিলাম।

গোলোক বলল, যদি সত্যিই আমি চলে যাই, ধর—

ঝর্ণা হেসে ফেলল। অগাধ বিশ্বাসে ভর করে ঝর্ণা বলল, আর আপনি যেতে পারবেন না, আমি জানি।

গোলোক বলল, কি জান?

ঝর্ণা বলল, আমাকে কথা দিয়ে সে-কথা আপনি ভাঙতে পারেন না।

গোলোক চুপ করে গেল।

ঝর্ণা বলল, আপনি চলে গেলে আমি হয়তো বাঁচতাম না, মাস্টারমশাই।

গোলোকের চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল। যে প্রবল উন্মাদনা সঞ্চিত হয়েছে তার দেহে, প্রকাশের পথ না পেলে তার ভিতরটায় যেন বিস্ফোরণ হবে।

ঝর্ণা স্পষ্ট করে বলল, আপনাকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না!

—ঝর্ণা, এ কী সত্যি?

—সত্যি মাস্টারমশাই।

—কি করে এমন হল?

—তা তো জানি নে।

—ঝর্ণা, ঝর্ণা, আজ একবার বাইরে যাবে?

—না না, আজ নয়, আজ আমি আপনার সঙ্গে কোথাও বেরুতে পারব না মাস্টারমশাই।

—তবে এখানেই বসি। তোমার হাত ছুটো ধরি।

—না না, কাঁপা কাঁপা গলায় ঝর্ণা বলল, আজ নয়, আজ নয়, আজ আপনি যান। আমি, আসি—

ঝর্ণা এক ছুটে ভিতরে চলে গেল।

না, ঝর্ণার সঙ্গে আর বাইরে বেরুনো হয় নি আমার। তার পরদিনই ঝর্ণার মা ঝর্ণাকে নিয়ে এলাহাবাদে চলে যান। ভাইয়ের মেয়ের বিয়েতে। সারা পশ্চিম ঘুরে ছুমাস পরে যখন ঝর্ণা মায়ের সঙ্গে কলকাতায় ফিরল, আমি আর তখন সেই আগের আমি নেই। যক্ষ্মাদষ্ট, অন্য জীবনের মানুষ। ঝর্ণা চিঠি লিখত হাসপাতালে। একটা চিঠিরও আমি জবাব দিই নি। কি লাভ? প্রথম প্রথম চিঠিগুলো খুলে পড়তাম। অনেক আশা-ভরসার কথা থাকত তাতে। তাই পরের দিকের চিঠিগুলো না খুলেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি।

সবই বললে, শুধু বললে না, সেই ছবিখানা কেন রেখেছ?

সে আমি নিজেই জানি নে। সত্যি জানি নে।

আগের দিন জানালায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছিল গোলোক। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। তাই সকাল থেকে বিছানায় শুয়ে গড়াচ্ছিল। ঝিটা আসে নি তখনও। একবার ইচ্ছে হল চা-টা নিজেই করে খায়। পরক্ষণেই ভাবল, তবে লোক রাখা হয়েছে কেন? আর উঠল না। তবে ঝি আসার দেরি দেখে মনে মনে বিরক্ত হল খুব। মাথাটা টিপ টিপ করছে। জ্বর জ্বর ভাব।

দরজায় খুট খুট শব্দ হতেই গোলোক দরজা খুলতে উঠল। দেখল এর মধ্যেই তার গা-গতর দিব্যি ভারি হয়ে উঠেছে। মাথা তো তুলতেই পারছে না। দরজা খুলতেই ঝি ভিতরে ঢুকল।

—বাব্বা, যা বিষ্টি আরম্ভ হয়েছে। ভিজে পুড়ে একশা হয়ে গেল। বিরক্তস্বরে ঝিটা বোধ করি তার দেরির সাফাই গাইল।

গোলোক বলল, আগে বেশ কড়া করে একটু চা বানাও তো। শরীরটা খারাপ লাগছে।

—কি হল, জ্বর হল নাকি বাবু!

—ঠিক বুঝতে পারছি নে। আজ আর ভাত খাব না ভাবছি।

হীটারে জল চাপাতে চাপাতে ঝি বলল, সেই ভাল। সাবধানে থাকাই ভাল। ট্যাকা দাও পাউরুটি নিয়ে আসি।

—আচ্ছা, আর দ্যাখো, ঐ সঙ্গে ডাক্তারখানা থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জার বড়ি নিয়ে আসবে।

চা খেয়ে একটু আরাম বোধ করল গোলোক। ঝিটা ঘরের কাজ সারছে। সে শুয়ে শুয়ে দেখছে। দেখল কত দায়সারা কাজ করছে ঝিটা। একদম যত্ন নেই কোন কাজে। নিজে হাতে যখন গোলোক ঐ সব কাজ করত, তখন ঘরখানা তকতক করত। যেন হাসত। এই কদিন মাত্র তো ঝিটা এসেছে। কিন্তু এর মধ্যেই কত ম্রিয়মাণ হয়ে এসেছে ঘরখানা। বিরক্ত হল গোলোক। কিন্তু কিছু বলল না। লাভ কী?

সেইদিনই প্রবল জ্বর এসেছিল গোলোকের। সঙ্গে সর্দি আর কাশি। দু-তিনদিন প্রায় বেহুঁশ হয়েই থাকল। তারপর জ্বর কমল, কিন্তু সর্দি-কাশি থেকেই গেল। দুর্বলতাও। ভয় পেয়েছিল সে। মৃত্যু ভয় কি? বোধহয় না। তবে ভোগার ভয়, দীর্ঘদিন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকার ভয়, ছিল বৈকি? নইলে এত তাড়াতাড়ি সে টি. বি. স্পেশালিস্টের দ্বারস্থ হল কেন? ডাঃ দত্তের পশার খুব। চেম্বারের ওয়েটিং রুমে বসতে হল অনেকক্ষণ।

অপেক্ষাকৃত অনেক অপরিচিত মুখের মধ্যে ছুটি তার চেনামুখ বেরিয়ে পড়ল। একটি সেই দোতলা ফ্ল্যাটের মেয়েটি। গোলোক তার আন্দাজ ভুল হয়নি দেখে মনে মনে খুশী হল। আর অপরটি তার সঙ্গী, নিশ্চয়ই স্বামী। গোলোক দেখল, মহিলাটি তাকে প্রথম দেখেই যেন একটু বিস্মিত হলেন। সঙ্গীর কানে কানে কি যেন বললেন। সঙ্গীটি পর মুহূর্তেই গোলোকের উপর একবার নজর বুলিয়ে নিলেন। গোলোকের অস্বস্তি লাগল। পরমুহূর্তেই সে দেখল, ওরা ছুজনে এক আমেরিকান সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ভদ্রলোকটি যে দ্বিতীয়বার তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নি, গোলোক তা লক্ষ্য করেছে। কিন্তু ভদ্র-মহিলাটি তার দিকে বারেবারেই চাইছিলেন। একবার গোলোকের সঙ্গে তাঁর চোখাচোখিও হল।

গোলোক একটু বিব্রত বোধ করল। তার কিছু করার নেই। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও দৃষ্টিটা গিয়ে বারবার ভদ্রমহিলার উপর পড়ছে। অন্যদিকে মন ফেরাবার জন্য সে বার-কয়েক ঘরে পায়চারি করল। তারপর একটা পত্রিকা আনতে এগিয়ে গেল। যে-র‍্যাকে অনেক পত্রিকা তাগাড় দেওয়া ছিল তার কাছেই ওঁরা ছুজন বসে আছেন। গোলোক দেখল ভদ্রমহিলার কোলে বেশ বড় একটা খাম। ওর ভিতরেই রয়েছে ভদ্রমহিলার ফুসফুসের এক্স-রে ফটো, গোলোক সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ভদ্রমহিলা যদিও স্বাস্থ্যবতী এবং এখন যদিও তাঁকে বেশ সতেজ সজীব দেখাচ্ছে, তবুও গোলোকের অভিজ্ঞ চোখ বলল, উনি কীটদষ্ট। তোমারই স্বগোত্রীয়। খামের উপর নাম লেখা রয়েছে। গোলোক কিছুতেই কৌতূহল চাপতে পারল না। পত্রিকা খোঁজার ভান করে নামটা পড়ে নিল। মিসেস মনোরমা মল্লিক। গোলোকের চোখ তাকে ফাঁকি দেয় নি।

বেছেগুছে একটা পত্রিকা নিয়ে দাঁড়াতেই মনোরমা বলল, আপনাকে আমাদের বাসাতেই দেখেছি যেন?

গোলোক দেখল মনোরমার চোখদুটো খুশীতে চকচক করছে। গোলোকের কি হল কে জানে মনোরমার চোখে সোজা দৃষ্টি ফেলে গলায় জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ।

মনোরমা সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীকে ঠেলা দিয়ে বলল, দেখলে! মনোরমা যেন ধাঁধাঁর উত্তর মিলিয়েছে, তেমনি হাসি হাসল। ভদ্রলোকও হাসলেন।

বললেন, তাই তো দেখছি। গোলোককে বললেন, কতদিন হল এসেছেন? খুবই রিসেণ্টলি নিশ্চয়।

গোলোক বলল, আজ্ঞে না। এক বছর ধরে আছি। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই ওখানে বাসা নিয়েছি।

—বলেন কি! ভদ্রলোক অবাক হলেন। এতদিন এক সঙ্গে আছি! কই জানি নে তো!

মনোরমার দৃষ্টিতে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখল গোলোক। এতটা যেন সেও আশা করে নি। গোলোক মনোরমার চোখে চোখ রেখেই হাসল। অর্থাৎ এতে অবাক হবার কি আছে।

—মিঃ মজুমদার, প্লিজ!

ডাক্তারবাবুর সহকারী তাকে ডাকতেই সে ভিতরে চলে গেল।

ডাঃ দত্ত বেশ যত্ন করেই তাকে দেখলেন। বুক পিঠ ঠুকে বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, নাথিং, কিছু পেলাম না। কমন কোল্ড। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতন হয়েছিল আর কি?

সহকারীকে বললেন, মিসেস মল্লিক।

গোলোকের সংশয় দূর হয় নি। সে বলল, একটা প্লেট তোলালে হত না?

ডাঃ দত্ত প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বললেন, স্যাটিস-ফ্যাকশানের জন্য যদি তোলাতে চান, তোলান না। তবে বুকে আপনার কিছু নেই। ক্লিয়ার। এই নিন, এই ফাইলটা কিনে নিয়ে যান। ব্যবস্থামত খাবেন। ঠাণ্ডা যেন লাগাবেন না। মিসেস মল্লিক?

মনোরমা ঘরে ঢুকতেই গোলোকের দিকে চাইল। তার মুখে আবার একফালি সন্তুষ্টির হাসির রেখা ফুটে উঠল। গোলোক বেরিয়ে যেতে ভাবল সে হাসি যেন বলল, আমরা তাহলে একই ঝাঁকের পাখি।

বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোলোক যখন প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তখন দেখল মিঃ মল্লিক আর মনোরমা তার কাছাকাছি এসে পড়েছেন।

—এই যে, মিঃ মল্লিক বললেন, এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। হোয়াট এ পিটি !

গোলোক হেসে বলল, যা ভীড়, বাসে উঠতেই পারলাম না।

—কোন্‌দিকে যাবেন ? মনোরমা জিজ্ঞাসা করল, বাসায় ?

গোলোক বলল, হ্যাঁ।

মিঃ মল্লিক বললেন, বেশ তো। আমাদের সঙ্গেই চলুন না। এই ট্যাক্সি !

ট্যাক্সিতে উঠে মিঃ মল্লিক বললেন, আসুন, এইবার পরিচয়টা শেষ করি। আমি পানু মল্লিক।

মনোরমা হাসতে হাসতে বলল, মিঃ পি. এন. মল্লিক। আমি মনোরমা। মিসেস মল্লিক।

—আমি, গোলোক গোটা গোটা করে বলল, গোলোক মজুমদার।

গাড়ী থেকে নেমে গোলোক ধন্যবাদ জানিয়ে সরে পড়ছিল। মনোরমা বলল, এত তাড়া কিসের আপনার ? আসুন না, একটু চা খেয়ে যান।

গোলোকের খুব ক্লান্তি লাগছিল। যাতায়াতে বেশ পরিশ্রম হয়েছে। এখন বিছানায় গা এলিয়ে দিতে পারলে সে যেন বাঁচে।

ক্লান্তস্বরে সে বলল, শরীরটা খুব খারাপ। আর দাঁড়াতে ইচ্ছে

করছে না। কিছু যদি মনে না করেন, আলাপ যখন হলই তখন আরেকদিনই, একাই থাকি আমি, সঙ্গী-সাথী তো কেউ নেই।

—না না না, সে কি কথা। মিঃ মল্লিক বলে উঠলেন। যান, আপনি যান। আমরা তো আর পালাচ্ছি না। আসবেন, সুবিধা পেলেই আসবেন। যখন খুশী।

—হ্যাঁ আসবেন, ডুব মেরে থাকবেন না। মনোরমা হাসতে হাসতে বলল। আমাকেও বড় একা থাকতে হয়। মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠি।

গোলোক দেখল, মনোরমা হাসির আড়ালে এক জমাট বিষাদকে ঢাকবার চেষ্টা করছে। পারছে না।

ডাঃ দত্তের কাছ থেকে ফিরে এসেও খুঁতখুতি যায় নি গোলোকের। এক্স-রেটা না করানো পর্যন্ত সে যেন শান্তি পাবে না। অথচ সেটা করতেও মনের জোর পাচ্ছিল না। গোলোক লক্ষ্য করছে, দিনের পর দিন, কি যেন হচ্ছে তার। উৎসাহ উদ্যম, সব ধীরে ধীরে নষ্ট হতে বসেছে তার। কোন কাজে মন লাগে না, কোন কাজে জোর লাগে না। সে যেন মেরামতের অযোগ্য মোটর গাড়ী। ফেলে রাখা হয়েছে একপাশে। ধীরে ধীরে কলকব্জায় মরচে ধরে আসছে।

চারদিন পরে সে আবার ঘর ছেড়ে বেরবার উদ্যোগ করল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর দরজায় আসতেই মনোরমা ডাকল, এই যে গোলোকবাবু, শরীর ভালো তো? বেরুচ্ছেন না কি?

গোলোক দেখল মনোরমা বারান্দায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। মনোরমার মুখ-চোখের ভাব দেখে মনে হল, সে যেন অকুল সমুদ্রে একা একা ভাসছিল, এইমাত্র একটি মানুষের দেখা পেল।

মনোরমা ম্লান হেসে জিজ্ঞাসা করল, কি, খুব ব্যস্ত ?

গোলোকও হাসল। না, ব্যস্ত আর কি ?

—তবে আর কি, চলে আসুন ওপরে। একটু সময় নষ্ট করে যান।

গোলোক দ্বিরুক্তি না করে ওপরে উঠে গেল। মনোরমা দরজা খুলে দিয়ে হাসল। মনোরমার চুলের সুবাস যেন ফ্ল্যাটটায় ছড়িয়ে রয়েছে। মনোরমা দরজা বন্ধ করে বারান্দাটায় এগিয়ে গেল। পিছনে গোলোক। কত চুল মনোরমার। সারা পিঠ ঢেকে পাছা পর্যন্ত নেমে গেছে।

দুটো চেয়ার টেনে দুজনে মুখোমুখি বসল। গোলোক একবার ঘাড় বেঁকিয়ে নিজের ঘরটা দেখে নিল। এ-দিকের জানালাটা বন্ধ আছে।

মনোরমা হাসতে হাসতে বলল, কদিন আর জানালা বন্ধ করে থাকবেন ?

গোলোক বলল, না, এবার খুলে দেব।

গোলোক দেখল এ-কথায় মনোরমার চোখে যেন আলো খেলে গেল।

মনোরমা বলল, সেই ভাল। খুলেই রাখবেন। নইলে লোকে নানারকম সন্দেহ করতে পারে।

—সন্দেহ করবে কেন ?

—করবে নাই বা কেন, বলুন! আমারই তো ধারণা ছিল, আপনি হয় ফেরারী আসামী, আর না হয় নোট জাল করছেন!

গোলোক মনোরমার কথা শুনে হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল। এমন হাসি সত্যিই সে আর হাসে নি। হাসতে হাসতে তার মনের অবসাদ অনেক কেটে গেল।

—তাই বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে চেয়ে দেখতেন। ফেরারী আসামীর চোখাচোখি হবার ভয় ছিল না কি। হাঃ হাঃ। হাঃ হাঃ।

—ওমা, আপনি কী সাংঘাতিক ! মনোরমাও শরীরে ঢেউ তুলে হাসতে লাগল। এটাও লক্ষ্য করেছেন। না, সত্যি বলছি, আপনার সম্পর্কে আমার প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল। তাই ডাঃ দত্তের চেম্বারে আপনাকে দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। আরও অবাক হলাম, আপনি যখন বললেন, এক বছর ধরে এই বাড়ীতে আছেন। আমরাও বছরখানেক হল এখানে এসেছি। গত জুলাইয়ে। আপনি ?

—মে মাসের শেষে।

—তাহলেই দেখুন, ভাগ্য কেমন আমাদের জুটিয়ে দিয়েছে এক জায়গায়। আপনিও হাসপাতাল ফেরত, আমিও তাই। রোগটাও এক। আপনি কতদিন হাসপাতালে ছিলেন ? কোথায় ?

এ-এক অদ্ভুত আলাপ। গোলোক কারও সঙ্গে রোগ সম্পর্কে আলাপ করত না। খুব বিরক্ত হত। কিন্তু মনোরমার কথায় তার রাগ হল না। কারণ, মনোরমাও তারই পর্যায়ের। সত্যি বলতে কি, গোলোক এই প্রথম এক দোসর পেল, যার সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলা যাবে।

গোলোক বলল, আমি ছিলাম কাঁচড়াপাড়ায়। প্রায় দেড় বছর।

মনোরমা বলল, তবে তো কিছুই না।

গোলোক ভাবছিল মনোরমার কথা জিজ্ঞাসা করা সমীচীন হবে কিনা।

মনোরমা নিজেই বলল, আমার আর কোনো হাসপাতাল, কোনো স্যানাটরিয়াম বাদ নেই বোধ হয়। আট বছর ভুগেছি। বার তিনেক অপারেশনই করতে হয়েছে। এই বছর-দুই হল ভাল হয়েছি। আমার কথা আর বলবেন না।

মনোরমা করুণ মুখে হাসল। গোলোকের বুকটা টনটন করে উঠল সমবেদনায়।

মনোরমা বলল, বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে। চার মাস

পরেই এই কাল রোগে ধরল। তারপর থেকে দেখুন, হাসপাতালের বেডে বেডে শুয়েই প্রায় বুড়িয়ে গেলুম। ভাগ্যিস, মিঃ মল্লিকের মত স্বামী পেয়েছিলুম তাই! মনোরমার মুখে গর্বের রেখা ফুটে উঠল। না হলে আমার অবস্থা যে কি হতো, ভাবতেও ভয় হয়।

মনোরমার মুখে-চোখে আতঙ্কের ছায়া খেলে গেল।

—আমার জন্য ও যে কি করেছে আর না করেছে, তা ওই জানে। আট বছর ধরে বেস্ট ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে, বেস্ট হাসপাতালে রেখেছে। কত টাকা খরচ হয়েছে বলুন তো!

মনোরমাকে কথায় পেয়েছে। গোলোককে কথা দিয়ে-দিয়েই যেন আঁকড়ে ধরতে চায়। গোলোকের খারাপ লাগছে না, কেন না বহুদিন পরে সে-ও যেন নিঃসঙ্গত্বের খোলসটি ফেলে মুক্তির আস্বাদ পাচ্ছে। নিজের চারদিকে গণ্ডী টেনে রাখার কোন মানে হয় না। এই সাজানো ফ্ল্যাটটা খুব ভাল লাগছে গোলোকের। রেলিং বেয়ে বেয়ে মাধবীলতা উঠেছে টব থেকে। ছোট বড় নানা টবে ফুল ফুটে আছে। মৃদু গন্ধ ভেসে আসছে। সুন্দর, সত্যি সুন্দর এক জগৎ সৃষ্টি করে বসে আছে মনোরমা মল্লিকরা।

—টাকাও বড় কথা নয়, মনোরমা বলল।

মনোরমা যদি পারে, এমন সুন্দর এক সংসার রচনা করতে, আমি কেন পারব না। গোলোক ভাবছে।

মনোরমা বলল, জানেন, আমার জন্যে বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কও তুলে দিয়েছে ও।

গোলোক ভাবল, মনোরমার আঁকড়ে ধরার অবলম্বন আছে।

মনোরমা বলছে, কারণ কি জানেন?

গোলোক ভাবছে, আমার এমন অবলম্বন কই?

—শাশুড়ী ওকে আবার বিয়ে করতে বলেছিল। বিয়ে করলে অবশ্য একটা অবলম্বন হত। তাইতে বাবুর কি রাগ!

হ্যাঁ, বিয়ে করতে পারলে—

—রাগ করে, ঝগড়া করে বেরিয়েই এল বাড়ী থেকে—

সংসারের দায়িত্ব নিতে পারলে—

—তারপর আমায় নিয়ে সংসার পাতলো। কত কীর্তিই না হল।

হয়ত এই জড়ত্ব কাটতো—বিষণ্ণতার অবসান হতো—

—আমি কতবার ওকে বলেছি—

মনোরমা তো আমার চেয়েও বেশি ভুগেছে—

—আমার জন্যে সকলকে ছাড়ছ কেন?

তবু তো সে কেমন সংসার পেতে বসেছে—

—বলে কি জানেন, বলে, ও-কথা বলো না, তোমাকে ওরা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়, আমার সব সুখ তোমাকে ঘিরে।

সত্যি কত সুখী এরা—

—বুঝুন, এমন স্বামী ক'জনের হয়—

খুব সুখী এরা—

—পাখি যেমন তার ডানা দিয়ে অসহায় বাচ্চাকে ধরে রাখে, আপনাদের মিঃ মল্লিকও তেমনিভাবেই আমাকে ঘিরে রেখেছেন।

বিয়ে করলে আমিও—

—কি জানেন গোলোকবাবু—

আমিও কি সুখী হতাম—

—ও গোলোকবাবু।

হয়তো হতাম, হয়তো না—

—আরে বাঃ, বেশ লোক তো, ও গোলোকবাবু—বেশ জোরেই ডেকে উঠল মনোরমা।

—অ্যাঁ, ডাকটা কানে যেতেই গোলোক সাড়া দিল। এতক্ষণ খুব দূর থেকে তাকে যেন কেউ ডাকছিল। এবার সে কানের কাছে মুখ এনে বুঝি চেঁচিয়েছে। গোলোক চমকে উঠল। দেখল মনোরমা খিলখিল করে হাসছে।

—বাঃ বাঃ, বেশ লোক, আমি এদিকে বকে মরছি আর উনি দিব্যি ঘুমুচ্ছেন।

—না না, গোলোক অপ্রস্তুত হয়েবলল, আমি আপনার কথাই শুনছিলাম তো।

—থাক আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না।

—সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন, ঘুমোই নি আমি।

—তবে নিশ্চয়ই কারও ধ্যান করছিলেন। নইলে মানুষ এত অসাড় হয়ে যায়? কানের কাছে ঢাক-ঢোল পিটলেও সাড়া মেলে না। মনোরমা হাসতে লাগল। অকস্মাৎ অন্তরঙ্গ কৌতূহলে সে প্রশ্ন করে বসল, কার কথা ভাবছিলেন, বলুন না!

গোলোক বিষাদ-ভরা দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। চোখে চোখ রেখে সোজা। তারপর তেমনিভাবে চেয়েই বলল, আপনি কি বলতে চাইছেন জানি নে, তবে আপনাকে সত্যি কথাই বলছি, বিশ্বাস করুন, তন্ময় হয়ে ভাবার মত কেউ এখন আমার নেই! গোলোক লক্ষ্য করল তার মনে ঝর্ণার নামটা এসে পড়েছিল। তাই হয়তো সে তার স্বীকারোক্তির সঙ্গে 'এখন' কথাটা জুড়ে দিল।

গোলোক দেখল, তার কথা শুনতে শুনতে মনোরমার চোখেও বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল আর সেই সময়ই গোলোকের মনে হল মনোরমার চোখ দুটো কত সুন্দর। এত গভীর, এত অতল চোখ সে আর আগে দেখে নি। এখানে নির্ভয়ে আশ্রয় নেওয়া যায়।

মনোরমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কথা বলতে গিয়ে দেখল, গলাটা তার ধরে গেছে। একটু কেসে গলাটা সাফ করে নিল মনোরমা। বলল, আপনার কে আছেন গোলোকবাবু?

গোলোকের অনেকদিন পরে বাড়ীর কথা মনে পড়ল। আশ্চর্য, সে প্রায় ভুলতেই বসেছিল।

বলল, দাদা আর বৌদি।

—তবে বাড়ীতে কেন থাকেন না? আপনার তো আর শাশুড়ী নেই।

মনোরমার এই সরল বিদ্রূপে গোলোক একটু হেসেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল। জবাব দিল না।

মনোরমা তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, বুঝেছি। তারপর আবেগে অস্থির হয়ে উঠল, উত্তেজিত হল। বলল, মুখে ওরা যতই বলুক আমরা সেরে উঠেছি, একেবারে ভাল হয়ে গেছি, কিন্তু মনে মনে ওরা তা মানে না। ওরা ভাবে ভাল আমরা হইনি, কখনোই হব না। তাই আমাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে চায়। আমি বুঝি, সব বুঝি। তাই কোন সংসারে আমাদের আশ্রয় মেলে না।

মনোরমার চোখ জলে ভরে উঠল।

—আমার স্বামী অস্বাভাবিক মানুষ, হ্যাঁ অস্বাভাবিকই বলব। আমার শাশুড়ী, আপনার দাদা-বৌদি যদি স্বাভাবিক মানুষের নমুনা হয়, তবে আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, মিঃ মল্লিক একজন অস্বাভাবিক ব্যক্তি, নয় কি বলুন? তাই আমি আশ্রয় পেয়েছি। তবু একটা নিজের সংসার গড়ে নিয়েছি। না হলে আমার অবস্থা কি হতো ভেবে দেখুন তো। উনি আবার বিয়ে করতেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায় টাকার খুব একটা অভাব নেই ওঁর। আমার সারাজীবন ভাল স্যানাটরিয়ামে থাকার মাসোহারা ঠিক জুগিয়ে যেতেন। শাশুড়ী ননদরা এই সব পরামর্শই ওঁকে দিয়েছিলেন। ওনার মত লোক বলে তাই সে-সব পরামর্শে কান দেন নি। রাগ করেছেন বাড়ীর লোকের ওপর। আমাকে নিয়ে এই নিভৃতে যেন পালিয়েই এসেছেন।

মনোরমা হাঁফ নেবার জন্য থামল। কিছুক্ষণ অন্য দিকে চেয়ে রইল। বুঝি একটুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

তারপর যেন আপন মনেই বলে উঠল, আমার ভয় কোথায় জানেন? আমার আশঙ্কা হয়, আমি যে সেরে উঠেছি, সত্যি সেরে উঠেছি একথা হয়তো উনিও বিশ্বাস করেন না।

গোলোক চমকে উঠল। মনোরমার দিকে চেয়ে দেখল, সে মুখ ফিরিয়ে দূর আকাশে চোখ মেলে বসে আছে। এই সেই চেহারা, প্রথমদিন জানালা খুলে যার দিকে গোলোকের নজর পড়েছিল। এ যে যক্ষ্মা হাসপাতালের মেয়াদী রোগী, এখন আর তাতে একটুও ভুল হয় না। এমন অনেক দেখেছে গোলোক। সেখানে নিস্পৃহ-ভাবে দেখত গোলোক, এখন আর তেমন নিস্পৃহ থাকতে পারল না। মনোরমাকে সান্ত্বনা দিতে মন চাইল।

বলল, এ-আশঙ্কার কোন ভিত্তি নেই, মিসেস মল্লিক।

—হয়তো তাই, মনোরমা উত্তর দিল। তারপর গোলোকের দিকে ফিরে বলল, কিন্তু না, মিসেস মল্লিক-টল্লিক নয়, মনোরমা, সোজাসুজি মনোরমা বলবেন। এ-জগতে অন্যের চাইতে আপনি আমার আপন। কারণ, আমরা একই যন্ত্রণার ভাগী। আমরা দুজনেই পতিত। সেই সম্পর্কে আমিও সমানভাবেই আপনার আপনজন।

খুব সুন্দর করে বলতে পারে মনোরমা। গোলোক আশ্চর্য হয়ে গেল। তার মনের অনেক চাপা অশান্তি এই সময়টুকুর মধ্যেই দূর করে দিল মনোরমা। গোলোক দেখল মনোরমাও অনেক শান্ত হয়ে এসেছে। তার শ্রান্ত মুখ-চোখে খুশির আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

মৃদু হেসে বলল, আজ যত কথা বললাম, এত বুঝি গত গোটা জীবনেও বলি নি। উনি জানতে পারলে ভড়কে যাবেন। ওঁর ধারণা সামান্য পরিশ্রম হলেই বুঝি রোগটা রিল্যাপস করবে।

অনেকদিন পরে গোলোকের মনের গুমোট ভাবটা কেটে গেল। এমন নিশ্চিন্ত, এমন আরামের ঘুম সে অনেকদিন ঘুমোয় নি। ঘুম ভেঙ্গে এত তাজা-তাজা ভাবও তার অনেকদিন বোধ হয় নি। বেশ প্রফুল্ল মনেই সে বিছানা ছেড়ে উঠল। বেশ সকাল-সকালই

আজ ঘুম থেকে উঠেছে। মুখ ধুলো। হাল্কা শরীরটা নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালো। ঝি আসার দেরি আছে এখনও। হীটার জ্বেলে চায়ের জল বসিয়ে দিল। খাটে এসে বসে দেখল, আর কিছু তার করার নেই। অন্যদিন হলে সে আবার গা এলিয়ে দিত বিছানায়। আজ আর সে-ইচ্ছে করল না। আলস্যে সময় কাটানো ঠিক না। একটা কিছু কাজ করতে পারলে ভাল লাগত। হঠাৎ একখানা খবরের কাগজের অভাব বোধ হল তার। পৃথিবীর সঙ্গে অসহযোগ করে ছিল সে, তাই কাগজ পড়তে চাইত না। এ-বাড়িতে আসা ইস্তক খবরের কাগজের মুখ সে দেখে নি। আজ ঠিক করল, এবার থেকে একখানা করে খবরের কাগজ রাখবে।

বসে বসে এ-ও ভাবল, অনর্থক আর সময় নষ্ট না করে আবার ছবি আঁকতে শুরু করবে কিনা। না, এভাবে জীবন নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

চায়ের জল ফুটে উঠতেই অভ্যস্ত হাতেই সে চা তৈরী করে ফেলল। পেয়ালায় চুমুক মেরে দেখল, বেশ চমৎকার চা হয়েছে। এতদিন ঝিয়ের হাতের তৈরী চায়ের পাঁচন গিলেছে শুধু। না, এমন বোকামো করার সত্যিই মানে হয় না। চা তৈরী সে ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু যেই তাতে হাত দিল, দেখল বিদ্যেটা সে একটুও ভোলেনি। মনে আশা হল তার। তবে আঁকাটাও সে ভুলে যায় নি বোধহয়। আজই সে সরঞ্জামগুলো বের করবে। দেখবে সব ঠিক-ঠাক আছে কিনা। তারপর লেগে পড়বে কাজে।

আচ্ছা, মনোরমার একটা ছবি আঁকলে কেমন হয়। বিষণ্ণতার মধ্যেও যে আশার দীপ্তি মনোরমার চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে, ঐ অতল চোখেও যে প্রচণ্ড আস্থা উঁকি মারে তার ছবি আঁকতে ইচ্ছে হল গোলোকের। মনোরমাকে রাজী করানো হয়তো কঠিন হবে না। মনোরমার আন্তরিকতা গোলোকের মধ্যে নতুন উৎসাহ সঞ্চারিত করেছে। 'এ-জগতে আপনার চেয়ে আপন আর কেউ

নেই।' স্বল্প সময়ের পরিচয়ে এমন কথা জোর দিয়ে এক মনোরমাই বলতে পারে। অথচ কথাটার মধ্যে ফাঁকি নেই, প্রগল্‌ভতা নেই গোলোক তা বুঝেছে। তাহলে গোলোকের এত পরিবর্তন হতো না সে তা জানে। মনোরমা আশ্চর্য মেয়ে!

দরজার কড়া নড়ল। ঝিটা এল এতক্ষণে। গোলোক আজ আর উদাসীন থাকবে না ঠিক করল। ঝিকে দিয়ে ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে নেবে। গোলোক দরজা খুলেই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—এতে হাঁ হবার কি আছে? মনোরমা হাসতে হাসতে বলল, রিটার্ন ভিজিট।

একরাশ তাজা ফুলের মত দেখাচ্ছে মনোরমাকে। গোলোকেরও সাধ্য নেই আজকের মনোরমাকে যক্ষ্মা হাসপাতালের রোগী বলে ভাবে। মিঃ মল্লিকও যে পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন, এখন দেখল গোলোক।

একগাল হেসে গোলোক অভ্যর্থনা জানাল। কি ব্যাপার, আসুন আসুন!

ওরা দুজনে ঘরে ঢুকল। গোলোক ব্যস্ত হয়ে পড়ল অতিথিদের বসাতে।

মিঃ মল্লিক বললেন, অত ব্যস্ত হবার কিছুই নেই, আপত্তি না থাকলে বিছানাতেই বসি।

গোলোক হাসতে হাসতে বলল, স্পুটাম ফ্রি, ঘামে জার্ম থাকে কিনা জানি নে।

মিঃ মল্লিক হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, রসিকতাটি করছেন ভাল। তবে আমি ইমিউনড।

—বাঃ ঘরখানা বেশ খাসা তো। মনোরমা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। একটু গোছগাছ করে রাখেন না কেন?

সুবোধ বালকের মত গোলোক বলল, রাখব।

মিঃ মল্লিক বললেন, নিজে কিছু করতে যাবেন না মশাই। অন্য-মনস্কভাবে ভারি জিনিস কিছু তুলতে যাবেন, ব্যস্ তারপর হাসপাতাল।

যা রয়-সয় তাই করবেন। হাসপাতাল থেকে ফিরে রমারও কাজের বাতিকে পেয়েছিল। একদিন দেখি খাটের ওপর ভারিএকটা সুটকেস তুলছে। বুঝে দেখুন ব্যাপারটা, আমার তো প্রাণ উড়ে গেল ভয়ে।

—তোমার প্রাণ তো রাতদিন উড়েই আছে। মনোরমা বেজায় চটে গেল। মাঝে মাঝে জ্ঞান-গম্যিই হারিয়ে ফেল!

গোলোককে হাসতে দেখে মনোরমা বলল, না, না, হাসির কথা নয়। পাহারার চোটে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে আমার। ওর সঙ্গে ঘর করতে হলে হাসি বেরিয়ে যেত আপনার। হাল্কা খালি একটা সুটকেস তুললে যে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়!

—ভাগ্যক্রমে না হয় ওটা খালিই ছিল, মিঃ মল্লিক বললেন, কিন্তু ধরো ওটা যদি ভরা থাকত, কি ওটা একটা ট্রাঙ্ক হতো—

—কি ওটা যদি একটা গডরেজের সিন্দুক হতো, মনোরমা কথা জুগিয়ে দিল। বলে যাও, থামলে কেন?

—না, তুমি রাগছ বটে রমা, মিঃ মল্লিক মোলায়েম করে বললেন, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় একবার ভেবে দেখ, ওর থেকে যদি অঘটন একটা ঘটে যেত ক্ষতি হতো কার?

গোলোক ব্যাপারটা আর গড়াতে না দিয়ে ওখানেই থামিয়ে দিল—চা খাবেন কি? তাহলে চাপিয়ে দিই। এটা এতই হাল্কা কাজ যে বিপদ-আপদের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

মিঃ মল্লিক বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, লাইট ওয়ার্ক করবেন বৈকি!

—তাহলে আমিই বানাই। মস্তনোরমা শা হয়ে বলল এতে তোমার আপত্তি নেই তো?

—কিছুমাত্র না। হ্যাঁ, যে-কথা বলতে এলুম। আচ্ছা মশাই, আপনি তো বললেন, আপনার নাম গোলোক মজুমদার। একজন গোলোক মজুমদার তো ছবি-টবি—

গোলোক বাধা দিয়ে বলল, আমিই সেই ব্যক্তি। আপনি সে খোঁজ পেলেন কি করে?

মিঃ মল্লিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক, সঠিক খোঁজটা যে ঠিক সময়ে পাওয়া গেছে, এই ভাগ্যি। আমাদের অফিসের একটা ক্যালেণ্ডার তৈরী হবে। আমাদের পি-আর-ও আবার আর্ট ফার্ট বোঝে। এবারে নাকি তরুণ বাঙালী শিল্পীদের ছবি ছাপা হবে। সেই লিস্ট তৈরী হচ্ছে। তার মধ্যে এক গোলোক মজুমদারের নাম দেখলাম। তার আবার ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমার কেমন সন্দেহ হল। তা ভালই হল মশাই।

গোলোক বলল, ভাল আর কি হল। আমার তো কোন ছবিই নেই। আড়াই বছর ধরে হাতই দিই নি। আর তার আগের সব ছবি কোথায় গেছে কে জানে!

মনোরমার দিকে চেয়ে বলল, বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি নে, একটু আগেই মনে মনে ভাবছিলাম, ছবি আঁকা আবার শুরু করব কিনা!

—শুরু করবেন বই কি। নিশ্চয়ই করবেন। মিঃ মল্লিক উৎসাহ দিলেন। আমাদের পি-আর-ও সাহেব যখন লিস্টে নাম তুলেছেন, তখন আপনি সামান্য লোক নন।

গোলোক বলল, মিঃ মল্লিক, যদি একটা অনুমতি দেন তবেই আমি কাজে হাত দিতে পারি।

মিঃ মল্লিক বললেন, আমার আবার এত মান বাড়াচ্ছেন কেন? কি চাই বলুন না।

মনোরমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে গোলোক বলল, ওঁর একখানা ছবি আঁকতে চাই।

কৃতজ্ঞতার হাসিতে মিঃ মল্লিকের মুখখানা ভরে গেল। গোলোকের হাত দুখানা জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, বলেন কি মশাই! এতো আমার সৌভাগ্য। রমা, শুনলে? চমৎকার হবে। এর আবার পারমিশান কি?

মনোরমা হাসতে হাসতে বলল, গোলোকবাবুকে দেখতে ভালো-মানুষ হলে হবে কি? আইন বাঁচিয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে চান! ওঁর

অনুমতি তো নিলেন ওঁর স্ত্রীর ছবি আঁকবেন বলে, কিন্তু যার ছবি আঁকবেন, তার অনুমতি নিলেন না তো?

গোলোক মনোরমার দিকে চেয়ে বলল, তিনি তো আমার আপন জন, তাঁর আবার অনুমতি নিতে হবে কেন?

মনোরমার মুখে দেহের সব রক্ত যেন ছলকে পড়ল। সে তাড়া-তাড়ি বলে উঠল, আসল কথাটাই তো বললে না।

মিঃ মল্লিক বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখুন আমরা একটা জমি দেখতে বেরুচ্ছিলাম। বাড়ী করার শখ আমার অনেকদিনের। তা এমনই কপাল, সুযোগ আর পাই নে। বুঝলেন না, যার জন্য বাড়ী করা সে তো এতদিন হাসপাতালে স্যানাটরিয়ামেই কাটালো। যাক, এবার যখন সুযোগ এসেছে তখন শুভস্য শীঘ্রম্। একটা জমির সন্ধান পেয়ে দেখতে যাচ্ছিলাম দুজনে। রমা বলল, চল ওঁকেও ডেকে নিই। ভাবলাম এ-প্রস্তাব মন্দ নয়। কি যাবেন না কি?

মনোরমা বলল, আবার নাকি-ফাকি কিসের? এখন ওঁর কাজটাই বা কি! চলুন, চলুন। জামা-কাপড় বদলে নিন। আর আজ দুপুরে আমাদের ওখানে আপনার নেমন্তন্ন।

মনোরমার ঐ কীটদষ্ট দেহটার মধ্যে কী এমন শক্তি ছিল গোলোক, যা তোমাকে বার বার ভাসিয়ে নিয়ে গেছে? তার যখন খুশী সে তোমাকে নাচিয়েছে, খেলিয়েছে, প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে, অপ্রয়োজনে জীর্ণ বস্ত্রের মত পরিত্যাগ করেছে!

না না, মনোরমা আমাকে ছাড়তে চায় নি। আমি মনোরমার সত্তারই একটা অংশ যেন হয়ে গিয়েছিলাম। মনোরমা আমারও অনেকখানি ছিল। আর যে যাই বলুক, মনোরমা আমার সঙ্গে একটুও ছলনা করে নি। যা সে দিতে পারত, যা তার সাধ্যে ছিল, তাই আমাকে দিয়েছে, দিয়ে সে তৃপ্তি পেয়েছে। কিন্তু আমার দাবী আরও উচ্চগ্রামে বাঁধা ছিল। আমি তার সব চেয়েছিলাম, শুধু দেহটাই নয়।

কিন্তু মনোরমা কি করবে! তার ঐ দেহটি ছাড়া আর সবের দাবীদারই তো ছিল তার স্বামী। তার দেহের দাবীদার কেউ ছিল না। আর সেইখানেই তো তার জ্বালা।



আর সে-দাহ যে কত তীব্র তা গোলোকের চাইতে ভাল করে আর কে জানে! মনোরমার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা যত বেড়েছে ততই সে-দাহের তাত পেয়েছে গোলোক। সেও পুড়েছে মনোরমার সঙ্গে।

তবে শুরুতে গোলোক এ-দাহের আঁচ পায় নি। সে কি করে জানবে, যে পরিবারটাকে সে আদর্শ সুখী পরিবার বলে মনে করেছিল, তার মধ্যে এত অ-সুখ লুকিয়ে আছে। মানুষের চোখ কত ভুল দেখায়! মনোরমাদের সংস্পর্শে এসে গোলোক জানল, শুধু সুখ বলে সংসারে কিছু নেই। ঝর্ণাকে পায় নি বলে সে দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু তাকে পেলেও সে শুধু সুখ পেত কিনা, সন্দেহ। গোলোকের এই অভিজ্ঞতাও হল, পরিবার একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাতে দুঃখ আছে, তবু মনুষ্যজন্মের পরিণতিতে পৌঁছতে হলে ঘর তোমাকে বাঁধতেই হবে। এর আগে সব সংসারকেই গোলোক দূর থেকে দেখেছে। তার নিজেদের পরিবারেরও সে অংশবিশেষ ছিল না, ছিল প্রায় অতিথি। মনোরমা তার চোখ খুলে দিয়েছে।

যেদিন থেকে মনোরমার ছবি আঁকতে বসল সে, সেদিন থেকেই একটু একটু করে পরতে পরতে মনোরমাকে জানতে শুরু করেছে। গোলোককে সঙ্কোচ করত না সে। সব বলত। বলে হাল্কা হতো! বুকের বোঝা নামিয়ে আবার তাজা হয়ে উঠত। প্রত্যহ সিটিং দিতে বসত মনোরমা তার নিজের বারান্দায়। গোলোকই জায়গাটা পছন্দ করেছিল। মনোরমাদের ফ্ল্যাটে ঢোকামাত্র সুন্দর একটা গন্ধ

গোলোকের নাকে ঢুকত। খুব ভাল লাগত গোলোকের। এটা বোধ হয় মনোরমারই প্রসাধনের কোন গন্ধ। লতায় ফুলে ঢাকা বারান্দাটাও সৌরভ বিতরণ করত অকৃপণভাবে।

আকাশের দিকে পিছন ফিরে মনোরমাকে একটা সবুজ বেতের চেয়ারে বসিয়ে দিত গোলোক। তারপর গল্প জুড়ত। বেশির ভাগ গল্পই মনোরমার ঘর-সংসারের। মনোরমা বলতে শুরু করত। আর গোলোক তাকিয়ে থাকত মনোরমার মুখের দিকে। অপেক্ষা করত বিষণ্ণতার রাত্রি পেরিয়ে কখন তার চোখে-মুখে ফুটে উঠবে আশার উজ্জ্বল আভা। তার চোখ দুটো আন্তরিকতায় ভরে উঠবে। অতল-স্পর্শ চোখে নেমে আসবে গভীর সমুদ্রের মায়া। সেই প্রথমদিন এ-বাড়িতে আসামাত্র গোলোক যে-মনোরমার দেখা পেয়েছিল, ঠিক তাকে দেখার প্রত্যাশায় হাত গুটিয়ে বসে থাকত। কখনও কখনও তার আভাস পেলেই তুলি বুলোতো ক্যানভাসে। গোলোক দেখল, যত সহজে সে ঝর্ণার ছবিটা এঁকে ফেলতে পেরেছিল, তত সহজে মনোরমার ছবিতে এগোতে পারছে না।

গোলোকের ভাব দেখে মনোরমা হাসত। বলত, জানি বাবা, সব জানি, তুমি কি কম চালাক!

গোলোক জিজ্ঞাসা করত, কি জানো মনো?

—এই ছবি আঁকা-ফাঁকা সব তোমার ছল।

—বলো কি!

—ঠিকই বলছি। আমি জানি।

গোলোকের হঠাৎ মনে হল ঝর্ণাই বুঝি কথা বলছে।

—তবে কি জন্য আমি রোজ রোজ এ-বাড়িতে আসি।

—আসো শুধু আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বসে থাকতে।

মনোরমার কথা শুনে গোলোক হেসে ফেলল। বেশ বলেছ, গোলোক হাসতে হাসতে বলল, এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত মুখখানাকে স্থির করে রাখ দেখি। নড়ো না।

—আমি কি কাঠের পুতুল। মনোরমার লঘু স্বর মুহূর্তে তিক্ত হয়ে উঠল। যেমন ইচ্ছে দাঁড় করিয়ে রাখবে!

—না, তুমি মোমের পুতুল।

—তা জানি, তা জানি। তোমাদের চোখে আমি তা-ই। মনোরমা কর্কশ স্বরে বলে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রেলিং ধরে উদাস চোখে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। একটু পরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় মনোরমা বলল, পুতুলের চেয়ে বেশি গুরুত্ব তোমরা আমাকে দাও না কেন, গোলোক? শুধু সাজিয়ে গুছিয়ে, শুধু ঝাড়পোছ করে আলমারিতে তুলে রাখলে পুতুলের চলতে পারে। কিন্তু আমার, আমার কি তাতে চলে!

মনোরমা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

গোলোকের মনে হল, মনোরমার এই কথাগুলো যেন অন্তহীন গহ্বর থেকে উঠে আসছে। কিন্তু এর যে কী কারণ থাকতে পারে গোলোক তা বুঝে উঠতে পারল না। গত এক মাস এই দম্পতিকে খুব কাছ থেকে দেখেছে সে। মনোরমার জন্য মল্লিকদার দুশ্চিন্তা আন্তরিক। তার প্রকাশটা কিছুটা কমিক কমিক লাগতে পারে, প্রথম দিকে গোলোকের তাই লাগত। কিন্তু ক্রমশঃ দেখল, তার মধ্যে ভেজাল নেই এক ফোঁটা। স্ত্রীর প্রতি, অন্ধভাবে অনুগত এমন লোক আর আছে কিনা সন্দেহ। মনোরমার কর্তৃত্ব তাঁর উপর অসাধারণ। কিসে মনোরমা ভাল থাকবে, প্রফুল্ল থাকবে, গোলোক দেখেছে, মল্লিকদার সেই চিন্তা। মনোরমা জমি পছন্দ করল, তো সেই জমি দুদিনের মধ্যে কেনা হয়ে গেল। যে জিনিস সকালে চায় মনোরমা বিকেলেই তা এসে যায়। এমন স্বামী পেয়েছে মনোরমা, তবু তার এত অশান্তি কেন?

তুলি হাতে করে বসেই থাকল গোলোক। মনোরমা ঝাঁ করে এগিয়ে এসে গোলোকের হাত থেকে রঙ তুলি কেড়ে নিল। ছুঁড়ে ফেলে দিল নিচে।

প্রচণ্ড রাগতস্বরে বলল, মোমের পুতুলের ছবি আর আঁকতে হবে না, তুমি যেতে পার।

মনোরমা এমনভাবে কথাটা বলল যেন গোলোক ভাড়া করা আর্টিস্ট। তার কাজ পছন্দ হয় নি বলে মনোরমা তাকে ছাঁটাই করছে। গোলোক অবাক হয়ে মনোরমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ঠাট্টা করছে নাকি? কিন্তু না, চোখে-মুখে তো ঠাট্টার লেশমাত্রও নেই। যে-চোখ একটু আগেই জলভরা ছিল, এখন সেখানে আগুন ছুটছে।

—পরস্ত্রীর মুখের দিকে ছুতো করে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা হওয়া উচিত।

শপাৎ করে গোলোকের গালে যেন চাবুক মারল মনোরমা। কি বলছে ও! ক্ষেপে গেল নাকি?

—কি যা-তা বলচ মনো!

—যা-তা নয়, ঠিক বলছি। কি উদ্দেশ্যে রোজ রোজ আসো তুমি ছবি আঁকার নাম করে? এই নির্জন দুপুরে? যখন আমার স্বামী বাড়ী থাকে না? আমি সত্যই পুতুল নই, রক্তমাংসের জীব। মনে রেখো সেটা।

—ছিঃ ছিঃ, গোলোক দপ করে রেগে উঠল। থরথর করে কাঁপতে থাকল।—তুমি, তোমার মনটা এত নীচ!

—হ্যাঁ, আমি নীচ, আর তোমরা খুব মহৎ। এখন যাও। আর এসো না এখানে। পুতুল, পুতুল, পুতুল! ন্যাকামি!

গোলোক অপমানে, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল। ওর পিছনে মনোরমার দরজা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। গোলোকের তখনও বিশ্বাস হচ্ছিল না যেন, সত্যিই অমন একটা কাণ্ড ঘটে গেছে একটুখানি আগে। সে যেন এইমাত্র এক দুঃস্বপ্ন দেখে উঠল। স্বপ্ন যে নয়, এটা যে নিষ্ঠুর বাস্তব, তার সব থেকে বড় প্রমাণ, এখনও সে দাঁড়িয়ে আছে মনোরমাদের ফ্ল্যাটের দরজায়। আর বন্ধ দরজাটায়

মনোরমার কঠোর মুখখানা যেন আঁকা। মনোরমার কঠোরতাই দরজার রূপ গ্রহণ করেছে!

আকস্মিক এই অপমানের পর গোলোক চাইছিল না যে মনোরমার নামও সে উচ্চারণ করে। কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু বারবার ঘুরে-ফিরে ঐ নামটাই তার মনে আসছিল। এই একমাসে গোলোক দেখল, আশ্চর্য এক অভ্যাস তৈরী হয়ে গেছে তার। মনোরমার সঙ্গ পাবার অভ্যাস। এ সম্পর্কে সে বিশেষ সচেতন ছিল না। আজ চারদিন সে একবারও যায় নি। জানালাটাও খোলেনি ঐ ধারের। একবারও মনোরমার মুখ দেখে নি। প্রথমদিন রাগটা গনগনে হয়ে জ্বলছিল। তার মনের মধ্যে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সে যা-ইচ্ছে হয়েছে মনে মনে সেই গালি দিয়েছে মনোরমাকে। রাগের তেজ পরদিনই ফুরিয়েছে। তার অপমান-বোধটা এখনও আছে। কি এমন অন্যায় করেছে গোলোক? অপমানজনক কি এমন বলেছে? মোমের পুতুল! এতে ক্ষেপে যাবার কি আছে? তাছাড়া ওতো কথার পিঠে কথা। সত্যি বলতে কি, পুতুলের কথাটা মনোরমাই আগে তুলেছে। মনোরমা বলল, আমি কাঠের পুতুল? গোলোক ঠাট্টা করে বলেছে না, তুমি মোমের পুতুল। এতেই মনোরমা এত ক্ষেপে গেল যে, অপমান করে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েই দিলে! তাজ্জব! গোলোক বার বার বিস্মিত হয়, ঘটনাটা মনে পড়লে।

অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই তো কিছু? মনোরমা যা বলল, এ হয়তো ওর কথা নয়। বদনাম রটালো নাকি কেউ তাদের নিয়ে? না কি, মল্লিকদাই কিছু বলেছেন মনোরমাকে। তা সে-সব কথা আমাকে ভালভাবেই তো জানাতে পারত মনোরমা। এত গোপন

কথা বলতে পেরেছে আর এই সহজ কথাটা জানাতে পারল না। অন্য কোন ব্যাপার আছে!

আসলে মনোরমাই তাকে সহ্য করতে পারছিল না। ইদানীং, যেন তার উপর ক্ষুব্ধ, বিরক্ত হয়ে উঠেছিল মনোরমা। তাকে যেন এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছিল। কয়েকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল। তখন এর তাৎপর্য বোঝে নি গোলোক। এখন বুঝতে পারছে ওকে এড়িয়ে যাবারই সেটা ছল। দুজনে বসে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ মনোরমা উঠে চলে গেল। তারপর আর এলই না। গোলোক ডাকল, বার কয়েক ? প্রথমে তো সাড়াই দিল না। তারপর বলল, বড্ড মাথা ধরেছে, তাই শুয়ে পড়েছে সে। তারপর আর কিছু বলল না। গোলোকও আর ডাকল না। চুপচাপ বসে ক্যানভাসে রঙ ঘষতে লাগল। ঘণ্টা দেড়েক পরে বেরিয়ে এল মনোরমা। গোলোক বলল, ছাড়ল মাথা ধরা? মনোরমা নিস্পৃহ স্বরে বলল, মাথা ধরে নি তো। তোমার সঙ্গে শুধু শুধু কাঁহাতক আর বকবক করা যায়, তার চাইতে শুয়ে থাকা ঢের ভাল। তা তুমি যে এতক্ষণ আছ ? গোলোক ভাবল ঠাট্টা। বলল, কি আর করি, তোমার ছবিটাতেই রঙ বুলোচ্ছিলাম। মনোরমা শুধু একবার ওঃ বলে, আবার এসে বসল।

এখন গোলোক ভাবল, তখন থেকেই তাকে এড়াতে চাইছিল মনোরমা। এই রকম স্পষ্ট ইঙ্গিতগুলোও যে কেন বোঝে নি, তা ভেবে গোলোক অবাক হল, বিরক্ত হল নিজের ওপর। তখনই যদি মানে মানে সরে পড়ত সে! এ-অপমানটা তাহলে আর সইতে হত না।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছে না গোলোক। মনোরমা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তো গোলোককে কাছে টেনে নিয়েছিল, তবে আবার নিজেই এমন করে ঠেলে দিল কেন?

নিজের চিন্তায় এতই মগ্ন ছিল গোলোক যে দরজার কড়া নাড়ার

শব্দ সে শুনতে পায় নি। হঠাৎ তার কানে গেল কড়া খটখট করছে। দরজাটা খুলে দিল। ঝি। ও বাবা, বিকেল হয়ে গেল।

ঝি বাসন নিতে গিয়ে অবাক হলো। দাদাবাবু গো, এ কী ভাত খান নি?

গোলোকের মনে হল, ঐ যা, তাই তো। টের পেল তার খিদে পেয়েছে বেশ।

বলল, একটু চা বানাও তো।

আরেকটা সকাল গড়িয়ে গেল গোলোকের। অন্য দিনের মত হিসেব নিতে নিতে। সেই এক হতাশা, একই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই দুপুর এসে গেল। গ্রীষ্মের খাঁ খাঁ দুপুর। বৃষ্টি নেই। শুধু দাহ। গোলোকের মনে হল, তার মনের রসও বুঝি শুকিয়ে গেছে। বাইরের আর ভেতরের তাপে সে অস্থির হয়ে উঠল। সে প্রায় সিদ্ধান্তই নিয়ে বসল, এ-বাসা ছেড়ে যাবে। কাল থেকেই বাসার খোঁজে বেরোবে। দূরে, মনোরমার কাছ থেকে যত দূরে পারে, সে বাসা নেবে! মনোরমার সান্নিধ্যে সে আর থাকবে না।

তাই যদি তার ইচ্ছা, তবে গোলোক কলকাতা ছেড়ে চলে যাক না কেন? এখানে তার কে আছে?

কলকাতা ছাড়বার কথা মনে হতেই বিষাদে ডুবে গেল সে। 'আমি আপনার জন।' বোগাস। যত বাজে কথা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিল মনোরমা। ছেলেমানুষ যেমন ঝুমঝুমি পেলে ভুলে যায়, গোলোকও তেমনি মনোরমার ঝুমঝুমিতে ভুলে গিয়েছিল। গোলোকের হাই উঠল। শরীর এলিয়ে দিল।

কে যেন কড়া নাড়ল। গোলোক কান পেতে রইল। খট খট খট। হ্যাঁ, কড়াই নাড়ছে কে। দরজা খুলেই থ মেরে গেল। ঝর্ণা! অনেক-পরিবর্তন হয়ে গেছে ঝর্ণার। একটু ভারিক্কি হয়ে উঠেছে। ঝর্ণা হাসল।···দরজা ছাড়ুন, মাস্টার মশাই, ভেতরে যাই। ··ভেতরে কোথায় যাবে ঝর্ণা। তুমি পরস্ত্রী।···তাহোক মাস্টার

মশাই, আমি আপনাকেই ভালবাসি। এখনও বাসি। ভেতরে গিয়ে একটু বসি মাস্টার মশাই।···না ঝর্ণা, তা এখন আর হয় না। তুমি ভেতরে আসবে, আবার নতুন করে যন্ত্রণা দেবে। তোমাদের এ-খেলা আমি জানি।· ·ঝর্ণার চোখে জল, মুখে মিনতি।···আপনার কাছেই এসেছি আমি, ভিতরে যাব। যেতে দিন মাস্টার মশাই।···ঝর্ণা এগিয়ে এল।···তুমি পরস্ত্রী ঝর্ণা, দূরে থাক। কাছে এসো না। যাও ঝর্ণা, চলে যাও। অনেক ভুগেছি আমি, অনেক ভুগছি, দোহাই তোমার, আর না, আর না।···পাছে ঝর্ণা ঢুকে পড়ে, গোলোক তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল। ঝর্ণা কড়া নাড়ছে বাইরে থেকে। নাড়ুক। দুম দুম ধাক্কা দিচ্ছে, দিক। খুলবে না, গোলোক কিছুতেই দরজা খুলবে না···

খট খট খট। খট খট খট। গোলোকের তন্দ্রা ছুটে গেল। উঃ কি গরম। কি স্বপ্নই দেখল গোলোক! এখনও যেন ঝর্ণা কড়া নাড়ছে। ঘামে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। দরজা জানালা বন্ধ। ঘরে আবছা অন্ধকার।

খট খট খট। গোলোকের বুকের রক্ত ছলকে উঠল। এতো স্বপ্ন নয়। দরজার কড়াই নাড়ছে। ঝর্ণা সত্যিই তবে এসেছিল নাকি। না কি ঝিটাই এসে গেল। গোলোক দরজা খুলে দিল।

মনোরমা ঘরে ঢুকেই অপরাধীর মত বলল, কখন থেকে কড়া নাড়ছি। ঘুমুচ্ছিলে। এত গরমেও ঘুম হয় তোমার?

মনোরমা হাসতে চেষ্টা করল। হাসি ভাল ফুটল না। ব্যাপারটা এতই বিস্ময়কর যে হৃদয়ঙ্গম করতেই গোলোকের সময় লাগলো কিছুটা। গোলোকের মুখে কথা ফুটল না। কোনটা স্বপ্ন? আগে যেটা দেখল, না এখন যেটা দেখছে? না, এটা স্বপ্ন নয়। মনোরমা এসেছে। কারণ ও আসামাত্র ঘরে এক পরিচিত সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়েছে। সেটা স্বপ্ন নয়। এই ঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল মনোরমা, বঞ্চিত করেছিল গোলোককে তার সঙ্গ-সুখ থেকে;

বিতাড়িত করেছিল তার দরজা থেকে। এখন সে নিজেই এসেছে। আরও একদিন এসেছিল মনোরমা। বলেছিল রিটার্ন ভিজিট দিতে এলাম। এবার গোলোক তাকে বের করে দিয়ে বলবে না কি, রিটার্ন দিলাম মনোরমা।

মনোরমা ইতস্ততঃ করে বলল, কি অন্ধকার। একটু পরে আবার বলল, এই গরমে থাকো কি করে? পাখা নেই?

কি মতলব মনোরমার? গোলোক সতর্কভাবে মনোরমার গতি লক্ষ্য করতে লাগল। মনোরমাও গোলোকের হাবভাবে অপরিচিত প্রচ্ছন্ন বিরুদ্ধতার এক আভাস পেল। অভিমানে উথলে উঠল তার স্বর। কাঁপা কাঁপা গলায় মনোরমা বলল, আমার অন্যায়ের মাপ চাইতে এসেছি।

এতক্ষণ পরে গোলোকের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। কত রকম ন্যাকামিই জানে! একবার এমন ইচ্ছেও হল, ঠেলে বের করে দেয় ওকে ঘর থেকে।

—আমি সত্যি অন্যায় করেছি গোলোক। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ও-কথা বলে ফেলেছিলাম। ওর একটাও আমার মনের কথা নয়। কি, তুমি কিছু বলছ না যে! কথা বলবে না? বলবে না? বলবে না?

মনোরমা কি কাঁদছে?

—বেশ, আমি চললাম। তোমাকে আর বিরক্ত করব না। কাউকে না গোলোক। এ-জীবন আর রাখব না, এত বিড়ম্বনা আর সহ্য হয় না।

মনোরমা আর দাঁড়াল না। তরতর করে নেমে চলে গেল। এতক্ষণে অপমানের শাস্তি হল গোলোকের। খুশি হল। বোঝ এখন যন্ত্রণাটা কেমন লাগে! আত্মতৃপ্তিতে মত্ত হয়ে খাটের উপর আরাম করে বসল গোলোক। বসেই লাফিয়ে উঠল। সর্বনাশ! কি বলে গেল মনোরমা! জীবন আর রাখবে না! ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল গোলোকের।

লাফে লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে মনোরমার ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছল। দরজা খোলা। ভিতরে ঢুকে দেখল মনোরমা নেই। শোবার ঘরে গেল। দেখল মনোরমা একটা বাক্স থেকে জিনিসপত্র ফেলে কি যেন বের করল। ক্ষুর!

—মনো! বলে লাফ মেরে হাত চেপে ধরল।

হিষ্টিরিয়া রোগীর মত মনোরমা হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও। যাও এখান থেকে। যাও! যাও!

—মনো, মনো, কি হচ্ছে!

অতিকষ্টে মনোরমার হাত থেকে ক্ষুরটা নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল গোলোক! আতঙ্কে, পরিশ্রমে, উত্তেজনায় গোলোক শ্রান্ত কুকুরের মত হাঁফাতে লাগল। মনোরমা হঠাৎ গোলোককে প্রাণ-পণে আঁকড়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। ওর বুকে মুখ ঘষে ঘষে কাঁদতে লাগল। আর অস্ফুটস্বরে পাগলের মত বলতে লাগল, তুমি কেন এলে, কেন এলে, কেন এলে?

অকস্মাৎ গোলোকের সর্বদেহ থরথর করে কেঁপে উঠল। রক্ত উন্মাদ হয়ে উঠল। কি করছে, ভাবনা চিন্তা করার ফুরসৎ পেল না। সবল আলিঙ্গনে মনোরমাকে টেনে নিল বুকে। প্রচণ্ড চাপে ছুটো দেহকে যেন মিশিয়ে ফেলতে চাইল। তার ঠোঁটে চুমুর পর চুমু এঁকে দিল। মনোরমাও যেন এই পাগল করা খেলায় মেতে উঠল। আবেগের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে ওরা দুজনে বিছানায় গিয়ে বসল। ছুটো অস্থির চোখ অন্য ছুটো অবাধ্য চোখের দিকে চিকচিক করে উঠল। জ্বালা যন্ত্রণার চিহ্নও নেই কোথাও।

মনোরমা ফিসফিস করে বলল, এই, এই, দরজাটা খোলা আছে যে, ছাড় দিয়ে আসি।

গোলোক বোকার মত হাসল। ছেড়ে দিল মনোরমাকে। কিন্তু মনোরমা উঠে দু'পা যেতে যেতেই গোলোক হাত বাড়িয়ে মনোরমার আঁচলে টান দিল। বুক থেকে কাপড় খসে গেল মনোরমার।

বিব্রত হয়ে উঠল সে। গোলোকের দিকে ফিরে দাঁড়াল তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছে। কিসের ঘোর লেগেছে চোখে। নাকের ডগায় অজস্র ঘাম জমেছে। প্রতিটি লোমকূপের গোড়াতেই কে যেন এক একটি মুক্তাবিন্দু বসিয়ে দিয়েছে। অসহ্য তাপ সঞ্চারিত হয়েছে মনোরমার দেহে। অসহ্য উত্তেজনা, অসহ্য স্ফূর্তি যেন উপচে পড়েছে। থরথর করে কাঁপছে সে। হাঁপাচ্ছে সে! 'এই!' মিনতি করল মনোরমা। 'ওকী!' বাধা দিতে গেল গোলোককে! কিন্তু হাত আর তুলতে পারল না। কিচ্ছু জোর নেই। কোনমতে বলল, দাঁড়াও লক্ষ্মীটি, দরজাটা দিয়ে আসি। কিন্তু তার আগেই মনোরমা গোলোকের উত্তাল আবেগের তীব্র জোয়ারে আত্মসমর্পণ করেছে।

শেষ পর্যন্ত কে যে দরজাটা দিয়েছিল, গোলোক না মনোরমা, সেটা ওদের কারোরই মনে নেই।

মধুর এক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে ছিল বিছানায়। গোলোক অনুভব করছিল বিছানাতেও অপূর্ব সুন্দর ঘ্রাণটা ছড়িয়ে রয়েছে। মনোরমার অজস্র চুলেও মাখামাখি হয়ে আছে সেই একই সুঘ্রাণ। গোলোকের বুকে মাথা গুঁজে নিশ্চল পড়ে আছে মনোরমা।

যেন উন্মত্ত উত্তাল সুখের স্রোতে বেপরোয়া ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তো ওরা। যেন উন্মাদ, কুটিল, অজস্র ঢেউ, সবেগে আছড়ে পড়তো ওদের উপর। যেন তীরের মত শক্ত মাটি থেকে টেনে নিয়ে অটল বিক্ষুব্ধ এক আবর্তে ওদের ছুঁড়ে ফেলে দিত। ওরা অসহায় হয়ে ডুবত হাবুডুবু খেত। তখন কোন জ্ঞান থাকত না ওদের। ধীরে ধীরে চৈতন্যের উদয় হতে থাকলে ওরা আবিষ্কার করত, অবসন্ন শিথিল দুটি দেহ একই বিছানায় পাশাপাশি পড়ে আছে। গোলোকের মনে হত, মনোরমা আর সে জন্ম-জন্মান্তর ধরেই বুঝি এইভাবে, একই শয্যায় শুয়ে আসছে।

*তোমার অনুশোচনা হতো না গোলোক। গ্লানি বোধ করতে না মনে মনে?*

না তো। অনুশোচনা কেন ? গ্লানি কিসের ? না, কোন গ্লানিবোধ করি নি। দংশন অনুভব করি নি অনুশোচনার। এ-সব প্রশ্নই ওঠে নি তখন। না আমার দিক থেকে, না মনোরমার দিক থেকে। জানি নে, মনোরমা কখনও গ্লানিতে ভুগেছে কি না। সম্ভবতঃ আজও তার মনে অনুশোচনা নেই। আমার মনেই এ-প্রশ্ন একদিন দেখা দেয়।

তখন মনোরমার বাড়ীটা প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। সেদিন ছুটি ছিল। রবিবার। মল্লিকদা গোলোক আর মনোরমাকে বাড়ী দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুন্দর ছোট্ট দোতলা বাড়ীটা। একতলার কাজ শেষ। দোতলার কাজ দ্রুতগতিতে চলেছে।

মল্লিকদা মনোরমাকে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাতে লাগলেন। মনোরমা খুশীতে উপছে পড়তে লাগল। ঘুরে ঘুরে নিবিড় আগ্রহে দেখতে লাগল সে। প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল মনোরমা। মল্লিকদা সমান উৎসাহে জবাব দিতে লাগলেন। বোঝা গেল, মনোরমার এই আগ্রহে তিনিও খুব খুশী হয়েছেন। মনোরমা তার পছন্দ নিয়ে তর্ক জুড়ে দিল। বসবার ঘর, রান্নাঘর আর দোতলার বাথরুম নিয়ে মনোরমার সঙ্গে মল্লিকদার মতভেদ হল। মনোরমা স্পষ্টই জানাল, এ তিনটে জিনিস তার একেবারে পছন্দ হয় নি। ঢেলে সাজাতে হবে। প্রথমে আবদারের স্বরে বলতে আরম্ভ করেছিল, পরে জেদ ধরল। মল্লিকদা বিব্রত হলেন। যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রথমে বোঝাতে গেলেন। কেন যে এই রকম করা হয়েছে, বললেন। গোলোকের মনে হচ্ছিল, তিনি যেন কণ্ট্রাক্টার আর মনোরমা তাঁর কাজে ফাঁকি ধরে ফেলে বিল আটকে দেবার ভয় দেখাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত মনোরমা যেন চরমপত্র দিল। নিজের বাড়ীতেই যদি থাকতে হয়, তাহলে মনোরমার পছন্দ মতই

বাড়ীটাকে ঢেলে সাজাতে হবে। গোলোকের খুব বিরক্ত লাগছিল। একটা বাজে ব্যাপারে দুটো বয়স্কলোক অনর্থক সময় নষ্ট করছে। গোলোককে যেন ভুলেই গেছে ওরা। গোলোক দেখল, মল্লিকদা আর মনোরমা, এই দুজনে মিলে যে-গণ্ডি রচনা করেছে, তা গোলোক ভেদ করতে পারছে না। সে বাইরেই পড়ে আছে। অন্যদিন যে-মনোরমার নিবিড় আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে সে আর মনোরমা একত্বে মিশে যায়, এ যেন সে-মনোরমা নয়। এখানে এসেও মনোরমা একত্বে মিশে গেছে, কিন্তু অন্য আরেকটা পুরুষের সঙ্গে। অন্য আরেকটা ভূমিতে। এই মনোরমার কাছে সে পৌঁছতে পারছে না। তার অস্বস্তি লাগছে। তার বিরক্তি লাগছে। নাও বাবা, তাড়াতাড়ি এই খেলাটা শেষ করে ফেল। বাড়ী চল। গোলোক মনে মনে বলে ফেলল।

শেষ পর্যন্ত মনোরমারই জিত হল। মল্লিকদা রাজমিস্ত্রিকে ডেকে মনোরমার প্রস্তাবটা জানালেন। বুড়ো মিস্ত্রি মাথা চুলকে বলল, ভালই হবে হুজুর তবে অনেক খরচা বেড়ে যাবে।

মল্লিকদা মনোরমার দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, মালিকের ইচ্ছাই বড় কথা। খরচা তো তার চাইতে বড় নয় মিস্ত্রি।

মিস্ত্রি তৎক্ষণাৎ মনোরমাকে সেলাম করে বলল, সে তো ঠিক বাত হুজুর।

মনোরমার মুখের রূঢ় রেখাগুলি খুশীর উজ্জ্বলতায় কোমল হয়ে এল। মল্লিকদার হাত ধরে ছোট্ট খুকির মত ঝুলতে ঝুলতে বলল, যাই বল, জিনিসটা ভালই হবে। কিন্তু আর না, এবারে যাই চল।

দুজনে পাশাপাশি এগিয়ে গেল। মনোরমা একবার বলল, এসো গোলোক। কিন্তু গোলোকের মনে হল, সে ডাকে আন্তরিকতা নেই। সারাপথ দুজনের কেউই নজর দিল না গোলোকের প্রতি। বাড়ী নিয়ে, ওদের ভবিষ্যৎ সংসারের স্বপ্ন নিয়ে, ওরা মশগুল হয়ে

রইল। এই মনোরমার দেহে যে কোন তীব্র দাহ আছে, মনে যে অসহ্য জ্বালা আছে অতৃপ্ত কামনার, সে-কথা এখন কে বলবে!

পরদিন দুপুরে নিজের ঘরে বসে বসে এই কথাই ভাবছিল গোলোক। অন্যদিন এতক্ষণ সে মনোরমাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হয়। এই দুপুরের নির্জনতায় সে আর মনোরমা প্রকাণ্ড শয্যার আশ্রয়ে মিশে যায়। চিন্তা-ভাবনার কোন বালাই আর থাকে না। বাইরে কি ঘটছে, পৃথিবীটার অস্তিত্ব আছে কিনা, তারা দুজনেই আছে কিনা, সে খেয়াল থাকে না। চেতনা অবলুপ্ত হয়ে যায়।

আজ আর যেতে চাইছিল না গোলোক। মনের ভেতর একটা প্রশ্ন ঝাপসা হয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল। গোলোক অনেক চেষ্টা করছিল সেটা স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু পারছিল না। শুয়ে থাকতে ভাল লাগল না। উঠে পড়ল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করল খানিক। আবার এসে শুয়ে পড়ল। একটুক্ষণের জন্য হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ তার নাকে মনোরমার দেহের সেই অপূর্ব ঘ্রাণটা এসে লাগল। ধ্বক করে লাফিয়ে উঠল তার হৃদপিণ্ড। উচ্চকিত হয়ে উঠল গোলোক। মনোরমা এল নাকি? কই না তো। সে এখানে আসবে কেন? সে তো তার ঘরে, খাটে শুয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে গোলোকের জন্য। গোলোকের সারা দেহে দেখতে দেখতে প্রভূত উত্তাপ আর প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। মনোরমার দেহের আহ্বান দুর্বার হয়ে উঠল। আর স্থির থাকতে পারল না গোলোক। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল মনোরমার কাছে।

দরজা খোলাই ছিল। গোলোক অসহ্য দাহে দগ্ধ হতে হতে নিবিড় শান্তিতে অবগাহন করবার জন্যে হুট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। থরথর কাঁপা হাতে খিলটা আটকে দিল সদরের। তার পা দুটো এগিয়ে চলল অভ্যস্ত ঠিকানায়, মনোরমার শোবার ঘরের দিকে।

মনোরমা নানা রকম ক্যাটালগ বিছিয়ে বসেছিল একটা চেয়ারে।

অন্যদিন তার দেহটাকে ঢেলে দেয় বছানায়। গোলোকের দিকে একনজর চেয়েই আবার ক্যাটালগের পাতায় চোখ নামাল। বলল, আচ্ছা গোলোক, তুমি তো শিল্পী, বল তো শোবার ঘরের দেওয়ালে সবুজ রঙ ভাল, না ফিকে গোলাপী ভাল। মনোরমার গলার স্বরে, দেহের ভঙ্গীতে শান্ত শীতলতা। কামনার চিহ্নমাত্রও তার অবয়বের কোনখানে নেই। গোলোক প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল। পূর্ণবেগে যে জাহাজটি এতক্ষণ চলছিল, সে যেন হঠাৎ ডুবো চরে আটকে গেল। ঘরে ঢোকামাত্র মনোরমার দেহের ঘ্রাণ মাতাল করে তুলেছিল গোলোককে ; ছুটে গিয়েছিল সেই মাদকের দিকে। কিন্তু মনোরমা শীতলতার বোতলে সেটাকে ছিপিতে পুরে গালার মোহর মেরে দিয়েছে। গোলোক তার নাগাল না পেয়ে জ্বলতে লাগল।

মনোরমার চোখে এখন নতুন সংসারের স্বপ্ন। তার ঘোর এখনও কাটে নি। ঘরের দেওয়ালে, দরজা জানালায় কি রঙ লাগাবে, কি ধরণের পর্দা কিনবে, চেয়ারগুলোর ক'টা বেতের আর ক'টা বার্মা টিকের, পর্দাগুলো কোথাকার হবে, মেঝে মোজাইক করবে, না কার্পেট কিনবে, এ-ছাড়া কথা নেই মনোরমার মুখে। গোলোক হতাশায় মুষড়ে পড়ল। এক মুহূর্তও আর দাঁড়াল না। নিজের ঘরে এসে যন্ত্রণাকাতর দেহটাকে বিছানায় ছুঁড়ে দিল। বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে থাকল।

একটু পরেই মনোরমা এসে ঢুকল তার ঘরে। গোলোকের ঘরের বদ্ধ বাতাস একটু একটু করে ভরে উঠতে লাগল পরিচিত এক সৌরভে। গোলোকের মগজে প্রচণ্ড ঝড় বইতে লাগল। অতি কষ্টে সামলে রাখল নিজেকে।

—কি হয়েছে গোলোক ? হঠাৎ অমন করে চলে এলে যে ? উৎকণ্ঠায় মনোরমার স্বর কেঁপে উঠল।

গোলোক একটুও নড়ল না।

—এই, কি হয়েছে ? বলবে না আমাকে।

গোলোকের দেহে যেন বিস্ফোরণ ঘটল। সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে নিজেও ভেসে চলল। মনোরমাও ভেসে গেল।

আবার সেই মনোরম অবসন্নতা। ক্লান্ত দেহ, নিস্তরঙ্গ মন। মনোরমা নির্জীব হয়ে চোখ বুজে পড়ে আছে। গোলোক তার চুল নিয়ে খেলা করছে।

গোলোক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, ও বাড়ীতে কবে যাবে মনো?

মনোরমা যেন অনেক দূর থেকে জবাব দিল, আর মাস দুয়েক পরে।

মনোরমা চুপ করল। গোলোকও।

একটু পরে মনোরমা বলল, পুরো দুমাস আর নেই। এক মাস পঁচিশ দিন আছে।

আবার সব চুপ।

একটু পরে গোলোক বলল, ওটা বুঝি শুভদিন।

—ওটা আমার জন্মদিন।

আবার দুজনে চুপ।

—এই দিনটা কে বাছলো?

—ও।

দুজনে চুপ। ধীরে ধীরে ঘোরটা কেটে আসছে। জড়ানো জড়ানো কথাগুলো ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ফুটছে।

—মল্লিকদা বুঝি তোমাকে খুব ভালবাসে?

—খুব।

—আমার চাইতেও? আরও স্পষ্ট করে বলল গোলোক।

—হ্যাঁ।

এই স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত স্বীকারোক্তি গোলোকের হৃদপিণ্ডে যেন হুল ফুটিয়ে দিল। চুপ করে ব্যথাটা হজম করল সে।

—আর তুমি?

—আমিও বাসি।

—কাকে বেশি?

—তোমার আজ কি হয়েছে বল তো?

—কাকে বেশি ভালবাস, মনো? আমাকে না তোমার ওকে?

—তোমার কি মনে হয়?

—আমি স্পষ্ট জবাব চাই।

—স্পষ্ট জবাবই পাবে। বল না, তোমার কি মনে হয়?

—আমি বুঝতে পারি নে।

—কেন? তোমার কাছে আমার তো কিছু গোপন নেই। তবে কেন বুঝতে পার না?

গোলোক চুপ করে গেল। পরক্ষণেই আবেগ দিয়ে বলল, আমি তোমাকে পেতে চাই মনো।

—আমি কি আমাকে দিই নি?

—কি জানি, এখন কেমন মনে হচ্ছে, সব হয়তো দাও নি।

—কি দিই নি গোলোক? কি পাও নি বল?

—তোমার মন। তোমার ভালবাসা। প্রেম।

মনোরমা এ-কথার জবাব দিল না। গোলোক অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

—কি, জবাব দিচ্ছ না যে?

—কি জবাব এর হতে পারে তাই ভাবছি।

—মনোরমার বলবার ঢঙে যে বিষণ্ণ আন্তরিকতাটুকু ছিল, তা গোলোকের মনকে স্পর্শ করল।

গোলোক বলল, আমাকে তো এক মুহূর্তও ভাবতে হয় না মনো। আমি তোমাকে ভালবাসি তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। একটি দিন, একটি মুহূর্তও না। এ-কথা আমার কাছে দিনের আলোর মত স্পষ্ট। আর তোমাকে আমার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য ভাবতে হবে? আশ্চর্য!

—তুমি তাহলে আমার চাইতে সুখী গোলোক।

মনোরমার অন্তরে যত বিষণ্ণতা জমা হয়ে উঠেছিল, তা নিঃশেষে ঢেলে দিল গলায়। চিৎ হয়ে শুলো। গোলোক দেখল, মনোরমার অবয়ব যেন বিষাদের ঘেরাটোপ দিয়ে মোড়া রয়েছে। তার দৃষ্টি উদাস। কপালে রেখা ফুটে উঠেছে। মনোরমা কি যেন ভাবছে। অনেক ব্যবধানে চলে গেছে সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনোরমা বলল, তুমি সুখী, কারণ তুমি তোমার মনকে নিশ্চিত ভাবে জেনে ফেলেছ। সংসার নেই তোমার। তোমাকে মিথ্যা বলব না গোলোক, আমি আমার মনকে জানি নে। তুমি যে আমার কতখানি, সে তুমিও জান। প্রতিদিন জেনেছ। মুখের কথায় তার চেয়ে স্পষ্ট করে জানানো যাবে না। তবে তুমি আমার সব কি না, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছি নে। আমি জানি নে গোলোক, সত্যিই জানি নে। এ-প্রশ্ন যে উঠতে পারে, এ তো জানতাম না। তুমি আমার জীবনে ঝড়ের রথে সওয়ার হয়ে এসেছ। ভেবে-চিন্তে দেখবার সময় পাই নি তো আমরা।

মনোরমা গোলোকের একখানা হাত মুঠো করে ধরল। আবেগ ভরে বলল, আর তাইতো চেয়েছিলাম আমি। ক্রমাগত আট বছর মৃত্যুর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে যখন জীবনের সীমানায় ফিরে এলাম, তখন বাঁচার আস্বাদ পাবার জন্য আমার দেহ, আমার মন লালায়িত হয়ে উঠল। কিন্তু সংসারে ঢুকতে গিয়েই বাধা পেলাম। আট বছর আগে কালান্তক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যখন সংসারের সীমান্ত ছাড়িয়ে হাসপাতালে গেলাম তখন যারা আমার জন্য চোখের জল ফেলেছিল, হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে অনেক আশা নিয়ে আবার যখন সংসারে ঢুকতে গেলাম তখন তারাই আমার বৈরী হয়ে দাঁড়াল। সকলের চোখে সে কী চাপা আতঙ্ক, সে কী ভয়, কী সংশয়! উঃ সে ভাবা যায় না। এই দেখ, এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

মনোরমা ভয়ে শিউরে উঠল।

— ওরা আমাকে ঠাঁই দেবে না, ঠিক করেছিল। মনোরমা বলে চলল, যত রকম ষড়যন্ত্র করবার, সব করেছে। কিন্তু একটি লোক সে-সব ব্যর্থ করে দিয়েছে। সে আমার স্বামী। সে আমাকে সুস্থ করে তোলার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করেছে। ভারতের কোনও স্পেশালিস্ট আর বাকি রাখে নি। আমাকে আশা দিয়েছে, ভরসা দিয়েছে, অভয় দিয়েছে। সংকটতম মুহূর্তে পাশে পাশে থেকেছে। সংসার ছেড়ে আমাকে নিয়েই ঘর বেঁধেছে। প্রচণ্ড তার ভালবাসা। তার পরিচয় প্রতি মুহূর্তে দিয়েছে, দিচ্ছে। তাকে আমি বেশি ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা করেছ ? এর কি এক কথায় জবাব দেওয়া যায় ! বলো ?

অবুঝ গোলোককে যেন মিষ্টি কথায় প্রবোধ দিচ্ছে মনোরমা।

গোলোক বলল, কিন্তু তোমার অতৃপ্তি, তোমার জ্বালা তো তাতে মেটে নি !

—না একটুও না। কিন্তু মনোরমার কথায় দ্বিধা নেই। তুমি আমার জ্বালা মিটিয়েছ গোলোক। আমার দেহের দাহে শান্তির প্রলেপ লেপে দিয়েছ। পরিপূর্ণ বাঁচার স্বাদ তোমার কাছ থেকেই আমি পেয়েছি। আমার নারীজন্মের চরম সুখের সন্ধান তুমিই আমাকে দিয়েছ। যার জন্য আমি কাঙাল হয়ে উঠেছিলাম। আমি যে সেরে গিয়েছি, বেঁচে উঠেছি, মায়া-মমতা-স্নেহ শুধু নিতেই আসি নি, দিতেও এসেছি আমাকে উজাড় করে, আমার স্বামী এ কথা বুঝতে পারে নি। দেবার মধ্যেও যে সার্থকতা আছে, পূর্ণতা আছে, তোমার কাছ থেকেই তা জেনেছি। তুমি আমার পঙ্গুত্ব ঘুচিয়েছ। কি করে বলব তোমাকে ভালবাসি না। একি এক কথায় রায় দেওয়া যায় ? বলো !

গোলোক অস্থির হয়ে মনোরমাকে কাছে টেনে নিল। মনোরমার বুকে নিজের মুখখানা ডুবিয়ে দিল। মনোরমার বাঁ দিকের বুকটা চোপসানো। দু-দুবার অপারেশন হয়েছে। অন্য বুকটার উদ্ধত ভঙ্গীতে মনে হয়, সে যেন একাই অন্যের ঘাটতি পূরণ করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। গোলোকের অকস্মাৎ মনে হল, এবং এই

প্রথম মনে হল, মনোরমার শরীরটাও আজ যেন দুই সুরে কথা বলছে।

গোলোক অবুঝ শিশুর মত বায়না ধরল, ওসব আমি জানি নে, জানতে চাই নে মনো। আমি তোমাকে চাই, তোমার সবটুকু চাই।

গোলোকটা ছেলেমানুষ। মনোরমা হাসল। জবাব দিল না। গোলোকের আদরের প্রতিদান দিতে লাগল।

—তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। গোলোক একই সুরে আবৃত্তি করল। যেন মনোরমাকে কেউ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, তাই প্রাণপণ শক্তিতে বুকে আঁকড়ে ধরল মনোরমাকে।

—উঃ, লাগে গোলোক, ছাড় ছাড়, লাগছে! মনোরমা ব্যথায় কঁকিয়ে উঠল। তার ফুসফুসে প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। কয়েকটা পাঁজর কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর সেইখানেই না জেনে চাপ দিয়েছে গোলোক।

গোলোক মনোরমার এই যন্ত্রণা টের পেল না। আলিঙ্গন শিথিল করল না। নিজের আবেগে বলে চলল, আমি চাই, তুমি একান্ত করে আমার হবে, শুধু আমার।

অসহ্য যন্ত্রণায় মনোরমার শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। দম আটকে এল। ভিতরটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। ভয় পেল মনোরমা। সাংঘাতিক ভয়।

—ছাড়, ছাড়। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। হাঁফাতে লাগল। খুব রেগে গেল গোলোকের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখে। কোথায় চাপ দিয়েছে গোলোকের সে খেয়ালই নেই। আবার যদি কিছু হয়? যদি রিলাপ্স করে? হায় ভগবান! তাহলে আবার হাসপাতাল, স্যানাটরিয়াম। সুস্থ নীরোগ জীবনের সীমান্তের বাইরে আবার নির্বাসন। গোলোকের দুটো হাত আবার তাকে জড়িয়ে ধরতে আসছে। আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে হুঁশিয়ার হল মনোরমা। একটু সরে গেল। গোলোকের একটা হাত আস্তে আস্তে

এসে মনোরমার সুস্থ স্তনের উপর আশ্রয় নিল। মুহূর্তে একটা শিহরণের তরঙ্গ খেলে গেল। কিন্তু তখনও যন্ত্রণার উপশম হয় নি মনোরমার। ফুসফুসে এখনও খচখচ করছে। আস্তে আস্তে তাই গোলোকের হাত খানা সরিয়ে দিল আবার।

হঠাৎ গোলোক প্রস্তাব করল, চলো মনো, এখান থেকে আমরা চলে যাই কোথাও।

মনোরমা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, কেন ?

কেন! মনোরমার প্রশ্নে গোলোক বিস্মিত হল! বলল, কেন তা বুঝতে পারছ না। দুজনে আলাদা করে ঘর বাঁধব। শুধু তুমি আর আমি, আর কেউ না।

মনোরমা গোলোকের প্রস্তাবের কোন জবাব দিল না। বিছানা থেকে নেমে পড়ল। কাপড় চুল ঠিকঠাক করতে করতে শ্রান্তভাবে বলল, ওঁর আসবার প্রায় সময় হয়ে এল। এখন যাই।

গোলোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মনোরমার পথ আটকে দাঁড়াল। একটু রেগে গেল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, জবাবটা দিয়ে যাও।

মনোরমা অসুস্থ বোধ করছে। বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। গোলোকের মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠল সে। গোলোকের চোখদুটো যেন জ্বলছে। বলল, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে!

গোলোক চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আমি ভিখিরি নই মনোরমা। তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাবার অধিকার আমার আছে কিনা জানতে চাই।

মনোরমা কাতরভাবে বলল, বিশ্বাস কর, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। শরীরটা খারাপ লাগছে। কাল বলব, যা জানতে চাও, কাল জিজ্ঞাসা করো!

—না, না, এড়িয়ে গেলে চলবে না, গোলোক আবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। আজই, তোমাকে বলতে হবে।

মনোরমা এবার খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে বলতে

লাগল, তোমার আজকের ব্যবহার দেখে ভয় পাচ্ছি গোলোক! আমায় বলতে ইচ্ছে করছে, আমার স্বামীকেই আমি ভালবাসি, কিন্তু মিথ্যে আমি বলব না। যদি জানতাম, একমাত্র তোমাকেই ভালবাসি, তোমার সঙ্গে চলে গেলে আর কাউকে বঞ্চিত করার পাপ আমায় বর্তাবে না, তবে তোমার সঙ্গে চলে যেতে একটুও দ্বিধা করতাম না।

গোলোক বিরক্ত হল। তুমি কি সরল ভাষায় কথা বলতে পার না? কি বলছ, তা হয়তো তুমি নিজেই জান না। স্বামীকে বঞ্চিত করতে চাও না তো খুব বললে, কিন্তু আমার সঙ্গে শুতে যখন, তখন তোমার এই বঞ্চনা-টঞ্চনার কথা মনে পড়ত না।

—না, মনোরমার চোখে-মুখে আত্ম প্রত্যয়ের দৃঢ় ছাপ পড়ল। ও কখনও আমার দেহ দাবী করে নি। ও সদা-সর্বদা ভয় করত, স্বামীর অধিকার খাটাতে গেলে আমি আবার হয়তো রোগে পড়ব। তাই নিজেকে বঞ্চিত করেছে, আমাকেও। কিন্তু আমি রক্তে মাংসে গড়া। আমাকে আমি বঞ্চিত করতে চাই নি। তাই আমার দেহটা তোমাকে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, এইমাত্র অনুভব করলাম, ভালবাসি নে তোমাকে। তোমার চাইতে আমার স্বামী অনেক সহৃদয়, তাঁর অনুভূতি অনেক বেশি, তাঁর স্বার্থত্যাগ, দায়িত্ববোধও তোমার চাইতে অনেক বেশি।

মনোরমা হতভম্ব গোলোকের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এল আবার। গোলোক তখনও সেইভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। মনোরমার চোখদুটো টলটল করছে জলে। বলল, তোমাকে অদেয় কিছুই আমার নেই। যা আমার একান্ত, যা আমার নিজস্ব, তার সবটাই সবটুকুই তোমাকে দিয়েছি গোলোক, যা আমার নয় তা দিই কি করে? আমাকে ভুল বুঝো না। কিন্তু এইভাবেই কি আমরা থাকতে পারি নে?

গোলোক যেন ঘুম ভেঙে উঠল। ওর রাগ বিরক্তি মনোরমার এই

করুণ আবেদনে অনেক কমে এল। মনোরমাকে হারানোর বেদনাই প্রধান হয়ে উঠল। ভারী গলায় বলল, তা আর হয় না মনোরমা।

—তবে কি এই শেষ, গোলোক ? মনোরমার চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

গোলোকের মনে হল তার বুকটা খালি হয়ে যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল। বলল, এই শেষ মনোরমা, আর আমাদের যেন দেখা না হয়।

কিছুক্ষণ আর কোন সাড়াশব্দ পেল না গোলোক। ফিরে দেখল, কেউ নেই। তার বুকটা হু হু করে উঠল। ফাঁকা ফাঁকা ফাঁকা। অকস্মাৎ সব ফাঁকা হয়ে গেছে।

তারপর ? সব যদি শেষই হয়ে গেল এখানে তবে আবার কেন মনোরমার দেহের ফাঁদে জড়িয়ে পড়লে গোলোক ? চারুলতার আত্মহত্যার নিমিত্ত হলে কেন ?

দুর্বলতার জন্য। নাটকের অঙ্ক যেমন হিসেব কষে কষে শেষ করা যায়, মানুষের জীবনে তা পারা সম্ভব কিনা জানি নে। অন্তত আমি পারিনি। না-হলে চারুলতাকে পেয়ে যে-উদ্যমে ঘর বাঁধতে গিয়েছিলাম, মনোরমার একটি প্রবেশেই তা ভেস্তে যাবে কেন। আর চারুলতাও তো পোড়খাওয়া মেয়ে। অনেক ভুগেছে, অনেক দেখেছে। তবু একদিন আকস্মিকভাবে মনোরমাকে আর আমাকে এই বিছানায় সে শুয়ে থাকতে দেখল আর তারপর সে বাড়ী ফিরে আত্মহত্যা করল। কিন্তু ওকে দেখে কখনও আমার মনে হয় নি, এত কাঁচা কাজ করতে পারে। কিন্তু মনোরমা আর আমি এমন কাজ করব আবার, তাই কি ভেবেছিলাম !

মনোরমা চলে গেল। প্রথমে গোলোকের ঘর থেকে। তারপর কিছুদিন বাদে, সেই বাড়ীটা থেকে। মনোরমা চলে গেল। গোলোকের মনে গভীর দুটো দাগ রেখে গেল। একটা তীব্র অনুশোচনার। অপরটা প্রবল অতৃপ্তির।

যে-মুহূর্তে জানল গোলোক যে মনোরমার ষোল আনা অধিকার তার নয়, সে বড়জোর এক তরফের ভাগীদারমাত্র, সেই মুহূর্তেই তার অভিমান এবং অভিমানের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্ব চুরচুর হয়ে ভেঙে গেল। সে খুব ছোট হয়ে গেল। গোলোক সমস্ত জমা-খরচের পর দেখল, সে একটা কামুক ছাড়া আর কিছু নয়। ছি ছি করল নিজেকে। কী করেছে সে? খতিয়ে দেখতে লাগল গোলোক। দেখল, নিতান্ত পেশাদার এক লম্পটের মত পরস্ত্রীর সঙ্গে দিনের পর দিন শুয়েছে। সমাজ ও আইনের অনুশাসন ভঙ্গ করেছে। কৃতকর্মের অনুশোচনায় গোলোকের অন্তর পুড়ে যেতে লাগল। সে তো এ চায় নি। মনোরমার জার হবার বাসনা ছিল না তার। তবে কি চেয়েছিল গোলোক? মনকে প্রশ্ন করে গোলোক কোন জবাব পেল না। সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে জানে না। জানে না। না না, জানে বৈকি! সাফাই গাইল গোলোকের মন। মনোরমাকে নিয়ে ঘর বাঁধার গোপন এক আকাঙ্ক্ষা তার ছিল। এর কি কোন অর্থ হয়? গোলোকের বিবেচনা প্রশ্ন তুলল। অভিমান জবাব দিল, কেন, অর্থ হয় না কেন? অন্য লোকের স্ত্রীকে নিয়ে তুমি ঘর বাঁধবে, এটা কি নাবালকের আব্দার নয়? বিদ্রূপ করল গোলোকের বিবেচনা। মনোরমা কার স্ত্রী কি স্ত্রী নয়, সেটা আমার প্রশ্ন নয়। ও সব বিন্দুমাত্রও কেয়ার করিনে আমি। গোলোকের অভিমান গোলোককে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল।

মনোরমা যদি আমার হত, শরিকহীনভাবে আমার, তাহলে আর কিছু গ্রাহ্য করতাম না আমি। মনোরমাকে নিয়ে ঘর বাঁধতাম। সার্থক হতাম।

গোলোকের আফশোষ, কামনার স্রোতে অন্ধের মত, এমন অসহায়ের মত ভেসে যাচ্ছে সে যে এসব প্রশ্ন তোলবার অবকাশই পায় নি। মনোরমা যাবার সময় এক ঠেলায় তাকে যেন বুদ্ধি বিচার বিবেচনার কণ্টকিত চরায় তুলে দিয়ে গেছে। তার শ্রান্ত অনাবৃত দেহে এখন সে-সব খচখচ করে বিঁধছে। গোলোক অসহায়ের মত সে-পীড়ন সহ্য করছে।

সেই সঙ্গে গোলোকের অভ্যাসটাও খারাপ করে দিয়ে গেছে মনোরমা। কয়েকমাস ধরে উপোসী গোলোককে যে-তৃপ্তি মনোরমা ক্রমাগত জোগান দিয়ে গেছে, এখন মনোরমার হঠাৎ প্রস্থানে (অনুশোচনার প্রবল দংশন সত্ত্বেও) গোলোক তার অভাব নিদারুণ ভাবে বোধ করতে লাগল। দুপুর নিবিড় হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোলোকের রক্ত চঞ্চল হয়ে আসে। তার শরীরের প্রতিটি কোষে তীব্র ক্ষুধা জেগে ওঠে, প্রবল অস্থির হয়ে ওঠে গোলোক। বিগত দিনের স্মৃতিগুলির তীক্ষ্ণ দংশনে গোলোক ছটফট করতে থাকে। কত নিঃসঙ্গ সে। কি ভয়ঙ্কর রকম একা!

গোলোক দেখল, এমন সঙ্গীহীন থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে। বহু দিন পরে সে পরিচিত লোকদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। শিল্পীদের আড্ডায় ঢু মারল। কোন সুখ পেল না। তবে আঁকবার তাগিদ অনুভব করল। দুমাস ধরে ছবি আঁকল গোলোক। সাতখানা ছবি সে শেষ করল। একদিন বিচারকের দৃষ্টি নিয়ে সে পরীক্ষা করল ছবিগুলো। তেমন উৎরোয় নি। পরিশ্রম বরবাদ হয়ে গেছে। হতাশায় ডুবে গেল গোলোক। সে শেষ হয়ে গেছে। একেবারে খতম। কি করবে গোলোক? এখন? কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে? এখান থেকে চলে গেলেই কি এ ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পাবে সে?

নিঃসঙ্গতা দূর হবে ? পুনর্জন্ম পাবে ? জোর দিয়ে হ্যাঁ বলার মত প্রত্যয়ের দেখা পেল না গোলোক। যেখানে তুমি যাও গোলোক, তার অভিমান বলে উঠল, এই ক্ষুধা, এই জ্বালা, এই দাহ তোমাকে তাড়া করে ফিরবে, নিস্তার পাবে না। তাহলে কি করবে সে ? কেমন করে নিবৃত্ত করবে এই রাবণ-চিতার দহন ? বিয়ে কর। গোলোকের মন উত্তর দিল। চমকে উঠল গোলোক। এই কীটদষ্ট দেহটাকে কোন মেয়ে নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করবে ? কাকে চেনে সে ? কার কাছে গিয়ে বলবে, আমাকে এনেছি। এই নাও। অসম্ভব প্রস্তাব। গোলোক তিক্ত হাসি ছড়িয়ে দিল ঠোঁটে।

চারুলতা কি তোমার প্রস্তাবে আপত্তি করেছিল গোলোক ?

চারুলতা ? না আমার প্রস্তাবে সে আপত্তি করে নি। ঠোঁট টিপে হেসেছিল। তারপর একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙেছিল। হ্যাঁ না কিছুই বলেনি। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সে আদৌ বিশ্বাস করে নি। তার হাসিতে ছিল চাপা বিদ্রূপ, তার হাই তোলার ভঙ্গীতে ছিল প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য। জগতের কোন কিছুতেই বিশ্বাস ছিল না তার। কিন্তু রাত কি শেষ হয়ে এল ?

চারুলতার প্রসঙ্গ শেষ কর, গোলোক। এবার কলমটা কিছু জোরে চালাও।

চারুলতার আবির্ভাবও যেমন অদ্ভুত, তমনি তার ধরন-ধারণও। প্রথম দিনই গোলোকের চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল। দুদিন ধরে সমানে বৃষ্টি ঝরছিল। এক মুহূর্তও ছেদ পড়ে নি। ঝিটাও কামাই করেছে। বৃষ্টিতে গোলোকের বড় ভয়। ঘরে যা ছিল, তাই দিয়ে গোলোক দুদিন চালিয়েছে। চালিয়েছে মানে কি, প্রায় না খেয়েই আছে। ক্ষিধের চোটে খুব ভোরেই ঘুম ভেঙেছে তার। চা করতে গিয়ে দেখে এক

দানাও চিনি নেই। বেজায় বিরক্ত হল গোলোক। শব্দ শুনে বুঝতে পারল, গবগব করে বৃষ্টি পড়ছে। গোলোকের দুশ্চিন্তা বাড়ল। সর্বনাশ, আজও যদি না আসে বুড়ি? তাহলে তো নিরম্বু উপোস। কারণ, গোলোক না খেয়ে মরে গেলেও এই বৃষ্টিতে বাজার করতে বেরোবে না। রাস্তায় নামলেই কোমর পর্যন্ত ডুবে যাবে। না, তার বেরুবার প্রশ্নই ওঠে না। এক্সপোজারটি লাগলে আর দেখতে হবে না। তাহলে কি করবে সে? কি আর করবে, বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। চাদরটা টেনে দিল গায়ে। তারপর ক্ষিধের কামড়ে অস্থির হয়ে বুড়ি-ঝির মুণ্ডপাত করতে লাগল।

একটু পরেই কড়া নড়ল দরজার। যাক, নিচিন্ত হল গোলোক, এল তাহলে। বেশ করে ধমকাবে আজ ওকে। গোলোক উঠল না। শুয়ে শুয়েই বলল, খোলাই আছে।

দরজা খুলতেই গোলোক অবাক হয়ে গেল। বুড়ি তো নয়। এ আবার কে? গোলোক উঠে বসল। একটি যুবতী মেয়ে আপাদ-মস্তক ভিজে ঘরের ভিতর ঢুকল।

বলল, আপনি গোলোকবাবু তো?

গোলোক বিস্মিত হয়ে বলল, হ্যাঁ।

মেয়েটি হাসল ঠোঁট-টেপা হাসি। বলল, যাক বাবা, ঠিকানাটাও ভাল করে বলতে পারে নি। খুঁজে খুঁজে হয়রান। আমি চারু। চারুলতা। আপনার যে ঝি, সে তো পড়ে পা ভেঙ্গেচে। আমায় বললে, চারি, ক'দিন কাজ করবি বাবুর বাড়ী? বললাম, করব। বললে, তা হলে যা। বাবু রোগা মানুষ, ঘরে বোধ হয় কিছু নেই, হয়তো না খেয়ে আছে।

আবার হাসল। কোথায় কি আছে দেখিয়ে দিন।

গোলোক টাকা বের করে দিয়ে বলল, আগে বাজারে যাও, কিচ্ছু নেই। খুব ক্ষিদে পেয়েছে আমার। কাল থেকে প্রায় কিছুই খাই নি। সকালে চা খেতে গিয়ে দেখি, চিনি নেই। গোলোক

আবার বিরক্ত হল। কি যে করে বুড়ি। ওকে দিয়ে আর চলবে না দেখছি।

চারুলতা ঠোঁট টিপে হাসল। চোখের দৃষ্টিতে তার এমন একটা প্রত্যয়, যেন গোলোক যে একথা বলবেই, সে তা জানত। গোলোকের মনে হল, নিজের সম্পর্কে সে যেন অতিমাত্রায় সচেতন। হাত পেতে টাকা নিতে গিয়ে গোলোকের আঙ্গুলে চারুলতার আঙ্গুল ঠেকে গেল। কী কাণ্ড! গোলোকের শরীরটা শিরশির করে উঠল। গোলোকের মনে হল ইচ্ছে করেই এ-কাজ করল চারুলতা।

চারুলতা বলল, কি কিনব বলুন?

গোলোক বিরক্ত হয়ে বলল, তার আমি কি জানি? সংসারে কি লাগে জানো না?

চারুলতা হাসতে হাসতে বলল, সংসারে কি লাগে তা আমার জানা আছে। কিন্তু আমি তো আপনার ঘরের লোক নই বাবু, যে আপনার সংসারে কি লাগবে তাও জানব।

গোলোক ভাবল এক্ষুণি ওকে বিদেয় করে দেয়। পরক্ষণেই ভাবল, তাহলে সেই বিপদে পড়ে যাবে। তাঁর চাইতে বেশি বেশি করে জিনিস-পত্র আনিয়ে নিক ওকে দিয়ে, তারপর বিদেয় করে দেবে।

গোলোক রাগটা মনে মনে চেপে রেখে ওকে একটা বিরাট ফর্দ করে দিল। চারুলতা বাজার আনতে গেল।

চারুলতা জিনিসপত্রের বোঝা নিয়ে যখন ফিরে এল তখন গোলোক দেখল, তার সর্বদেহেই যেন বন্যা বইছে। আগেকার বিরক্তি দূর হয়ে গেল। করুণা হল গোলোকের। নিজেকে খুব স্বার্থপর বলে মনে হতে লাগল। সে জোয়ান মদ্দ পুরুষ হয়ে ঘরে বসে আছে, আর তারই ভোগের সামগ্রী সংগ্রহ করতে একটা মেয়েলোককে সে দুর্যোগের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

গোলোক বলল, ছ্যাখ, চারুলতা, ঐ ট্রাঙ্কে আমার কাপড় আছে, একটা বের করে নিয়ে পরো।

চারুলতা গোলোকের দিকে চেয়ে হাসল। ওর সতর্ক হাসি যেন বলল, ঠিক হিসেব মতই এগোচ্ছে কাজ। রান্নাঘরে গিয়ে চারুলতা নিজের ময়লা কাপড় ছেড়ে যখন গোলোকের ধোপভাঙ্গা কাপড় পরে এ-ঘরে এসে হাজির হল তখন তাকে ঝি ব'লে, বুড়ি-ঝিদের স্বগোত্র ব'লে যেন মনেই হল না। বরং তাকে এই পরিবেশের মানুষ বলেই গোলোকের মনে হতে লাগল। পোশাকের পরিবর্তনে কি এত পরিবর্তন হয়? চারুলতা নিমেষের মধ্যেই চা বানিয়ে এনে দিল। গোলোকের মনে হল, যেন কতকাল পরে সে চা খাচ্ছে। চা খাবার পর তার জড়তা কাটল। আজ তার আর কিছু করবারও নেই। তাই বিছানা ছেড়ে উঠল না।

চারুলতা নিঃশব্দে তার কাজ করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে গোলোকের খাবার বানিয়ে দিয়েছে। ঘর মুছে, বাসন মেজে, রান্না চাপিয়ে দিয়েছে। মাঝে মাঝে গোলোক চারুলতার নিপুণ হাতের কারিকুরি চেয়ে চেয়ে দেখছিল। একটা জিনিস অবাক হয়ে লক্ষ্য করল গোলোক, শরীর সম্পর্কে মেয়েদের যে অতিরিক্ত সচেতনতা থাকে, লজ্জাবোধ থাকে, চারুলতার তা একেবারে নেই। উবু হয়ে যখন মেঝে ঘসছিল, তখন চারুলতার গা থেকে কয়েকবার কাপড় খসে পড়েছিল, কিন্তু চারুলতা তাতে কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করে নি। গায়ে কাপড় তুলে দিতে তার যেন কিছুমাত্র তাড়া ছিল না। কাপড়ের আলগা আচ্ছাদনের মধ্য থেকে চারুলতার দেহের অনেক গোপনীয়তাই গোলোকের চোখে অনাবৃত হয়ে উঠেছিল। চারুলতার শরীরের আদলটা নিখুঁত। নিটোল গড়ন। এমন সুগঠিত দেহ খুব কম মেয়েরেই দেখা যায়। মুখ এমনিতে হয়তো সাধারণই কিন্তু কথায় কথায় চারুলতা হাসে আর অমনি তার ঠোঁটে একটা চাপা ব্যঙ্গের হাসির ঢেউ খেলে যায়, চোখ দুটো দেখলে তখন মনে হয়, যেন পৃথিবীর যাবতীয় রহস্য তার বোঝা হয়ে গিয়েছে; আর তাইতে চারুলতার স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়।

গোলোক এক সময় আশ্চর্য হয়ে দেখল, চারুলতার এই প্রায় অনাবৃত দেহটি ওর নিকট সান্নিধ্যে আসা সত্ত্বেও গোলোক কোন চাঞ্চল্য, কোন অস্থিরতা বোধ করছে না। সে দেখল তার নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা অনেকটা উপশম হয়ে এসেছে। তার ভাল লাগছে। এতদিন এ-ঘরে যেন অনেক ফাঁক ছিল। চারুলতা তার প্রথম দিনের উপস্থিতি দিয়ে তা যেন অনেকটা ভরে দিয়েছে। আর কোন অনুভূতির খোঁজ পাওয়া গেল না ওর মনে। শুধু একটা ভাল লাগার অনুভব তার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। অনেক দিন পরে শান্তি পেল গোলোক। তার চোখ ভরে ঘুম আসছিল। চারুলতার হাতে পরম বিশ্বাসভরে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল গোলোক।

—উঠুন, উঠুন! গোলোক চোখ মেলে দেখল চারুলতা ডাকছে।

—খাওয়া দাওয়া করবেন না? বাব্বা, কি ঘুম আপনার? সে হাসল।

গোলোক কেমন যেন লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি করে উঠে পড়ল। বলল, খেতে দাও, আমি মাথাটা ধুয়ে এখনই আসছি।

—সে কি, চান করবেন না?

—নাঃ, গোলোক জবাব দিল, আজ বেশ ঠাণ্ডা আছে। সর্দি লাগে যদি!

—গরম জল করে দিই তাহলে, চারুলতা বলল, একটু বসুন তবে, এক্ষুণি করে দিচ্ছি।

—না না, তুমি আবার কষ্ট করবে কেন?

চারুলতা বলল, এ কাজ তো আমার মাইনের মধ্যেই পড়ে। তা ছাড়া, এসব অভ্যাসও আছে। নার্সের কাজ শিখেছিলাম তো কিছুদিন।

—তাই নাকি? গোলোক অবাক হল। একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করল চারুলতাকে। চারুলতা ততক্ষণে হিটারে জল চাপিয়ে দিয়েছে।

—হ্যাঁ। চারুলতা একটু হাসল। কিন্তু শেখাটা শেষ করতে পারি নি।

—কেন? প্রশ্নটা গোলোকের মুখ দিয়ে হঠাৎ বের হল।

চারুলতা হাসল। বলল, দুটি ছোকরা ডাক্তারের জন্য। দুজনে মিলে আমাকে নিয়ে লোফালুফি করল। তাই রোগীর সেবা করার বদলে তাদেরই সেবাদাসী বনে গেলাম। তাদের দাবী মিটিয়ে আর নিজের কাজ করার সময় থাকত না। শিখব কখন!

চারুলতা ঠোঁট টিপে হাসল। চারুলতার কথাবার্তা শুনে গোলোক থ মেরে গেল। এ-রকম করে কোন মেয়ে যে কথা বলতে পারে সে ধারণা গোলোকের ছিল না। মুখের আগল নেই যেন চারুলতার। গম্ভীর হয়ে গেল সে। একেবারে বস্তির মেয়ে। ওর প্রগল্‌ভতাকে প্রশ্রয় দেবে না গোলোক। কথাবার্তা কমই বলবে, ওর সঙ্গে।

খেতে খেতে গোলোক কিন্তু সব ভুলে গেল। কী চমৎকার রাঁধে চারুলতা। খেয়ে যে এমন তৃপ্তি হয়, এর আগে গোলোকের সে অভিজ্ঞতা হয় নি। গোলোক খুব খুশী হল।

গদ্‌গদ হয়ে বলল, তোমার রান্নার হাত খুব ভাল চারুলতা।

চারুলতা শান্তভাবে হাসল। যেন বলতে চায়, এ আর নতুন কথা কি? এ তো আমি জানিই।

বলল, অনেক কষ্ট করে শিখেছি এটা।

—কোথায় শিখলে চারু? ইচ্ছে ছিল না কথা বাড়ায়, তবু ফস করে বলে ফেলল গোলোক।

চারুলতা বলল, বাগবাজারের এক বনেদী বাড়ীতে। বাবুর বাড়ীতে আয়ার কাজ করতাম। সেই বাড়ীতে এক ঠাকুর ছিল, সেই আমাকে এমন রান্না শিখিয়েছে। কত রকম রান্না যে সে জানত, তার যেন সীমা নেই। দু-তিন মাসেই আমি অনেক রান্না শিখেছিলাম। আরও কিছুদিন থাকতে পারলে আরও নানা রকম শিখে নিতুম। কিন্তু কপালে সইল না, চারুলতা হাসল।

—কেন ? গোলোক আবার জিজ্ঞাসা করে বসল। চারুলতার প্রতি তার মন ক্রমশঃ প্রসন্ন হয়ে উঠছে।

চারুলতা একটুও ইতস্ততঃ না করে বলতে লাগল, কেন আবার ? তার কণ্ঠে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠলো, বাবু যেদিন টের পেলেন, তাঁর ভোগে তাঁরই মাইনে-করা ঠাকুর ভাগ বসাচ্ছে, সেদিন অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। আমার গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বললেন, হারামজাদি কুত্তি, তোর প্রবৃত্তিরও বলিহারি যাই, তুই ভদ্দরলোকের বাড়ী থাকার উপযুক্ত নোস! রাস্তার কুকুর রাস্তায় যা। বেরো বাড়ী থেকে। আমাকে তক্ষুণি, সেই রাত্তিরেই বের করে দিলেন। ভেবেও দেখলেন না এত রাত্তিরে যাই কোথায় ? আরও মজা কি জানেন, গিন্নী-মা বাপের বাড়ী গেলে বাবু আমাকে পালঙ্কে তুলে, তোকে গয়না দেবো, বাড়ী করে দেব, মাথায় করে রাখব চারু, বলে রাতের পর রাত কত সোহাগ করতেন, সে-সব সোহাগের কথা সেই সময় দেখলাম বেমালুম উপে গেল। এমন কি আমার চার পাঁচ মাসের মাইনে বাকি ছিল, তাও দিলেন না। ভদ্দরলোকের আঁতে ঘা লাগলে তারা কিন্তু ছোটলোকেরও অধম হয়ে যায়। ওঁর চাইতে ঠাকুরটা অনেক ভাল। সে শুধু নেয় নি, কিছু দিয়েও তো গেছে। নয় কি ?

চারুলতা নিরুত্তেজ শান্ত গলায় সরলভাবে প্রশ্ন করে বসল। গোলোকের কানমাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। রাগে শরীরটা রি রি করতে লাগল। ধমক দিল, চুপ কর! তোমার আস্পদ্দা তো কম নয়।

গোলোকের রাগ দেখে চারুলতা অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। গোলোকের মনে হল, ধমক খেয়ে, একটা শিশুই যেন পরিণত মেয়ের দেহ ধারণ করে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে। গোলোক তাড়াতাড়ি সামলে নেবার চেষ্টা করল। অবশ্য বিরক্তিটা চাপতে পারল না। বলল, তোমার কথাবার্তা বড় বিশ্রী চারুলতা।

এতক্ষণে চারুলতার ঠোঁট চিরে আবার তার স্বভাবসিদ্ধ হাসিটা ফুটে উঠল।

তেমনি শান্তভাবে বলল, বাবুরা কথকতা শোনবার জন্যে তো আমাকে রাখেন না, যে-জন্যে রাখেন সে-সব আমার খারাপ নেই। আপনি নিজেও তো প্রমাণ পেলেন।

—কিসের প্রমাণ? গোলোক শঙ্কিত হল। এই ঠোঁট-কাটা মেয়েটা আবার কি বলবে তাকে। মনে মনে একটু ঘাবড়েই গেল গোলোক।

চারুলতা বলল, বাঃ! এই তো আপনি আমার রান্নার প্রশংসা করছিলেন!

— হ্যাঁ। গোলোক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

চারুলতা বলল, ঘরখানার দিকে একবার চেয়ে দেখুন না। কেমন আগোছাল, নোংরা করে রেখেছিল বুড়ি, আর এখন দেখুন আমিই বা কি করেছি। মিলিয়ে দেখে নিজেই বুঝবেন, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি নে।

না, তা বলছে না চারুলতা। গোলোক ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়েই তা দেখে নিল। ঘরের শ্রী ফিরে গেছে। তকতক করছে ঘরখানা। গোলোকের চোখে মুখে একটু হয়তো খুশির আভাসই ফুটে উঠল। চারুলতার সতর্ক চোখ সেটা তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলল। বলল, আপনি আমাকে কাজে লাগাবেন, মাইনে দেবেন তার জন্য। তার বদলে আমি আপনাকে পুরোপুরি খুশী করব। এই আমার দস্তুর। পছন্দ না হয়, কাজে গাফিলতি ঘটে, তাড়িয়ে দেবেন। কি, উঠছেন কেন? হয়ে গেল খাওয়া?

গোলোক বলতে বাধ্য হল, খুব তৃপ্তি করেই সে খেয়েছে। বলতে বাধ্য হল, এমন তৃপ্তি সে এর আগে আর কোনদিন পায় নি।

চারুলতা এ প্রশংসা যেন গায়েই মাখল না এ-যেন তার জানাই। গোলোক মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখে, মশলার বাটি আর সাজা পান নিয়ে চারুলতা দাঁড়িয়ে আছে। এ-অভিজ্ঞতাও গোলোকের জীবনে আনকোরা নতুন। চারুলতা পণ করেছে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতার আঘাতে গোলোককে ঘায়েল করে ছাড়বে।

বলল, এ-আবার কি? আমি তো পান খাই নে।

—তাহলে মশলা খান। ঐজন্যেই তো ছুরকম রেখেছি। সকালে সেজন্যই তো জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তা আপনি তো চটেই উঠলেন। আপনার অভ্যেস কি, তা তো জানি নে। আপনার যা দরকার খোলাখুলি আমাকে বলে দেবেন।

গোলোক মশলা নিয়ে চিবোতে চিবোতে তক্তপোশের উপর বসল। চারুলতা এঁটো বাসন তুলে নিয়ে গেল। একটু পরে এসে চারুলতা বলল, দেখুন, একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি। তখন ঘুমিয়ে পড়লেন তাই। আমার ভাতও কিন্তু রেঁধে নিয়েছি। একে তো ঘরে গিয়ে খাবার সংস্থান আমার নেই, তার ওপর এই বৃষ্টি। ভিজে ভিজে এখন যাব, আবার বিকেলে আসব আর সেই রাত্তিরে ফিরব। কত বার আর ভিজব। তার চাইতে এখানে খাওয়া-দাওয়া করে ওবেলার কাজ সেরে দিয়েই চলে যাব। কি আপত্তি নেই তো?

গোলোক বলতে যাচ্ছিল, ও-বেলার কাজ সে নিজেই করে নিতে পারত, তার জন্য চারুলতার থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বলতে গিয়েই ভাবল, চারুলতা যদি ভাবে খেতে দেওয়ার ভয়েই গোলোক তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিচ্ছে, তাই সে আর ওর প্রস্তাবে আপত্তি করল না।

চারুলতা খাওয়া-দাওয়া সারল। সারা ছুপুর ধরে নানান কাজ করল। এক ফাঁকে গোলোক দেখল, চারুলতা তার শাড়িটা পরে ফেলেছে। পান খেয়ে ঠোঁট ছুটো লাল করেছে। গোলোকের মনে হল, চারুলতা এরই মধ্যে এখানে চমৎকার এক গার্হস্থ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছে। যার আস্বাদ গোলোকের অভিজ্ঞতায় এ-যাবৎ অনুপস্থিত ছিল। চারুলতাকে এই পরিবেশে মানাচ্ছেও বেশ।

এক নতুন ধরণের আনন্দের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচয় ঘটছে গোলোকের। এ-আনন্দে উত্তেজনা নেই, জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই। এর প্রভাব মৃত্নু, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী।

গোলোকের মনের কোণে একটা আকাঙ্ক্ষা উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। আহা এ কি অসম্ভব? একেবারেই অসম্ভব? এমন একটা গার্হস্থ্য জীবন কি প্রতিষ্ঠা করা যায় না?

যে-আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর সেই প্রথম দিনটিতেই গোলোকের মনের গভীর গোপনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, চারুলতার প্রাত্যহিক সাহচর্যে এক মাসের মধ্যেই সেটা দ্রুত ডালপালা বিস্তার করে গোলোকের সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এখন তার অনেক সাধ। আর সে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখতে চায় না। গোলোক আর ছন্নছাড়ার মত থাকতে চায় না। সব সময় নিজের বোঝা বয়ে বেড়াতে আর ভাল লাগে না। ক্লান্তি এসেছে তার। অন্য কারোর হাতে নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিয়ে মুক্ত হতে চায় গোলোক।

ঝরণা তার মনে যে ফিকে দাগ (গোলোকের তখন কিন্তু এটাকে গভীর বলেই মনে হয়েছিল) রেখেছিল, মনোরমা এসে তা মুছে দিয়েছিল। শুধু মুছেই দেয় নি, সে নিজেও গভীরতর এক ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। এখন চারুলতার প্রবেশে, তার দৈনন্দিন সাহচর্যে সেই অতীত ক্ষতের আর চিহ্নমাত্রও রইল না। অথচ ঝরণা আর মনোরমার সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা (ঝরণার সঙ্গে আবেগের এবং মনোরমার সঙ্গে দেহের) গড়ে উঠেছিল গোলোকের, চারুলতার সঙ্গে তার শতাংশের এক অংশও গড়ে উঠল না। চারুলতা প্রথম দিন যতদূরে ছিল, এই একমাস পরেও সেই ততখানিই দূরে রয়ে গেছে। এ-একটা আশ্চর্য রহস্য বলে মনে হয় গোলোকের। চারুলতা এত নিঃসংকোচ, এত মুখফোঁড়, দেহ সম্পর্কে এত বিকারহীন (ইচ্ছে করলে যে-কোন মুহূর্তে চারুলতাকে খাটে এনে শোয়াতে পারে গোলোক। একবার মুখ ফুটে বললেই হল। সে জানে চারুলতা

একটুও আপত্তি করবে না। শুধু ঠোঁট টিপে হাসবে। আর সেই হাসিটা বলতে থাকবে : হ্যাঁ, এইবার পথে এসেছ, তবে এতদিন সাধুপুরুষটি সেজেছিলে কেন ? ) তবু চারুলতার কোথায় যেন একটা প্রতিরোধের শক্ত গণ্ডী আছে। সেটা পার হওয়া অসাধ্য।

গোলোক আর কোন মেয়ের ভগ্নাংশ চায় না। এবার ষোল আনাই চাই তার। সে কাউকে উজাড় করে দেবার জন্য যেমন প্রস্তুত, তেমনি তৈরী কাউকে উজাড় করে গ্রহণ করতে। সে যা যা চায় গোলোকের স্থির বিশ্বাস তা চারুলতা, একমাত্র চারুলতাই দিতে পারে। এ-বিশ্বাস কি করে তার হল, সে জানে না। তবে এটা জানে, গার্হস্থ্য সুখ অন্তরে অন্তরে সে যা কামনা করছে, মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখছে, তা তাকে চারুলতাই দিতে পারে।

চারুলতার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব সহজ হয়ে উঠেছে। আগে চারুলতার কথাবার্তা তার কেমন স্থূল, কেমন উদ্দেশ্য প্রণোদিত, কেমন অশ্লীল ইঙ্গিতময় বলে মনে হত। এখন গোলোক দেখল, তার প্রতিটি কথা সত্য। জীবনে অনেক ভুগেছে চারুলতা। বাপ-মায়ের স্মৃতিটুকুও তার মনে নেই। অনাথ আশ্রমে পালিত হয়েছে। ব্রহ্মচারী বাবার আশ্রম। একটু বড় হতেই চারুলতা দেখেছে, কিছু না দিয়ে এ-জগতে কিছু পাবার উপায় নেই। ব্রহ্মচারী বাবা যেদিন চারুলতাকে প্রথম শাড়ি দিলেন, সেদিন তিনি শুধু শাড়িই দেন নি, বৈজ্ঞানিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করলে গর্ভসঞ্চারের দায় কিভাবে এড়ানো যায় হাতে-কলমে চারুলতাকে সে শিক্ষাও দিয়েছিলেন। শিক্ষাটা যে কত মূল্যবান, পরবর্তী জীবনে পদে পদে টের পেয়েছে চারুলতা। যা-কিছু পেয়েছে চারুলতা, বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছ থেকে, তা হুদিনের আশ্রয়ই হোক, ছপাতা বর্ণ পরিচয়ই হোক, কি বৃত্তিশিক্ষাই হোক, কি কোন কাজ কর্মের ব্যাপারই হোক, তার জন্য চারুলতাকে বেতন দিতে হয়েছে, দেহের মূল্যে। চারুলতা দৃঢ়ভাবে জানে পৃথিবী অবৈতনিক নয়। এ-সব কথা স্পষ্ট করে যখন চারুলতা বলেছে, ওর

স্বকীয় প্রকাশ ভঙ্গীতে, তখন সে-কথা কখনও কখনও অশ্লীল বলেও মনে হয়েছে গোলোকের। কিন্তু আদ্যোপান্ত ইতিহাস শোনার পর গোলোকের ধারণা বদলেছে। বুঝেছে চারুলতা সত্য বই মিথ্যা বলে না। আর তার সত্য এত তিক্ত যে হজম করা শক্ত। গোলোকের মনে হয়েছে, এ-যদি অশ্লীলতা হয়, তবে সত্যও অশ্লীল।

চারুলতার দুর্ভাগ্য, সে পৃথিবীর একটা দিকই দেখেছে। জগতের অন্য পিঠটাও এবার তাকে দেখাতে চায় গোলোক। বোঝাতে চায় এ-ও সব নয় চারুলতা। এ-পৃথিবীর আরও একটা দিক আছে। সেদিকের বাসিন্দারা ভালবাসে, ঘর বাঁধে, ভালবাসার লোকের জন্য নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেয়। গোলোক নিয়মিত মনে মনে কাতরভাবে আবেদন জানায় চারুলতাকে, একটা সুযোগ সে তাকে দিক। কিন্তু মুখে সে এ-কথা একদিনও বলতে পারে নি। যেন ঠোঁটের কাছে এসেও আটকে গেছে।

···আমার ধারণা বদলে দেবার জন্য আপনার এত মাথাব্যথা কেন, গোলোকবাবু?···গোলোক যেন স্পষ্ট দেখতে পায় তার কথা শোনার পর জেরা শুরু করেছে চারুলতা। সব জানি হাসিটা ছড়িয়ে পড়েছে তার ঠোঁটে। যেন বলছে, কি চাই, সোজা কথায় বলুন না। বাজে ভণিতায় দরকার কি? ঘর বাঁধতে চান? ওঃ তাই বলুন। তা এর জন্যে এত ধানাই-পানাই কেন করছেন। আমাকে রাখতে চান। এই তো? বেশ, আজ থেকেই তাহলে থেকে যাই এখানে? বস্তির ঘরটা ছেড়ে দেব। আপত্তি? না, আপত্তি কিসের গোলোক বাবু। অনেকদিন পরে ভাল ঘরে থাকব, ভাল বিছানায় রাত কাটাব। এতে আপত্তি করব কেন? স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় ছেঁড়া কাঁথায় শুলে বুঝতেন, লোকে কেন ভাল বিছানার কাঙাল হয়। আর ভদ্দরলোকের বিছানায় এই তো প্রথম শুচ্ছি নে। সত্যি বলতে কি ভদ্দরলোকেদের পরিষ্কার যদি কিছু থেকে থাঁকে তো এই বিছানাটাই আছে।

গোলোকের দিব্যচক্ষে চারুলতার এই মূর্তিখানি ভেসে ওঠে। আর তার সাহস লুপ্ত হয়। কিছুই জানাতে পারে না গোলোক। অথচ এ-কথা জানাবার একটা তাগিদ, প্রবল তাগিদও অনুভব করে গোলোক। তার কেমন ধারণা হয়, সে পারবে। চারুলতার মরুভূমি-মনে সে বিশ্বাসের, ভরসার, ভালবাসার ফুল ফুটিয়ে তুলতে পারবে। ওর ঠোঁট থেকে অবিশ্বাসী হাসিটা মুছে ফেলতে পারবে। পারবেই। এটা একটা মহৎ কাজ বলে গোলোকের মনে হল। এটা তার মিশন।

এই চিন্তাটা গোলোককে কদিন ধরে আনন্দ দিতে লাগল। চারুলতা একটা কথা কিন্তু ঠিকই বলেছে, এ-জগতে কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। তবে তাই দেবে গোলোক। চারুলতার মনে ভালবাসা ধরাতে তার যা কিছু ভাল আছে, সব দেবে। এক নতুন তপস্যায় মগ্ন হবে গোলোক। গোলোকের মধ্যে যদি সত্য থাকে, সেই সত্যই চারুলতার চোখ ফোটাবে। এই চারুলতার পুরনো কাঠামোয় গোলোক তিল তিল করে নতুন এক চারুলতার সৃষ্টি করবে। সে হবে গোলোকের একান্ত আপন। কায়মনে তারই।

গোলোকের ভিতর সৃষ্টির প্রেরণা তীব্রভাবে জেগে উঠল। বাসনা প্রবল হল, চারুলতাকে মডেল করে ছবি আঁকার।

চারুলতাকে বলল, তোমার কয়েকটা ছবি আঁকব চারুলতা, আপত্তি নেই তো?

চারুলতার ঠোঁটে সেই হাসি। বলল, মডেল হতে হবে?

—বাঃ তুমি তো সব জানো দেখছি।

—জানব না কেন, চারুলতা তেমনি হাসতে হাসতে বলল, এক বাবু যে মডেল করে রেখেছিলেন আমাকে। এক মাস ছিলাম। দু টাকা রোজ পেতাম। প্রথম তিন-চারদিন একটা টুলে বসালেন। তারপর শোয়ালেন বেশ পুরু গদী আঁটা বেঞ্চিতে। তারপর আর সেখান থেকে প্রাণে ধরে নামাতে পারেন নি। পাঁচ-সাতদিনের টাকা বাকি ফেললেন যখন, তখন কড়া তাগাদা শুরু করলাম। একদিন

গোটা পাঁচেক টাকা হাতে দিয়ে বললেন, তোমার বুকের গড়ন ভাল নয় চারু, এ মডেল আমার চলবে না।

সঙ্গে সঙ্গে গোলোকের মুখ-চোখ ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। চারুলতা কী ভেবেছে তাকে? কিন্তু না, রাগ করে লাভ নেই। সংযত হল গোলোক।

দুঃখের সঙ্গে বলল, সবাইকে খারাপ ভাব কেন চারুলতা?

—ছি ছি, সে কী কথা! জিভ কাটল চারুলতা। নিতান্ত সরল-ভাবে বলল, খারাপ তো আমি কাউকে ভাবি নে। আসল ব্যাপারটা আমি তো বুঝেই ফেলেছিলাম। বাবুর রেস্ত ফুরিয়ে গিয়েছিল। নইলে অত তাড়াতাড়ি আমাকে বিদেয় দিতেন না। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎটাও আমাকে দেখতে হবে তো। সেই গদী-আঁটা বেঞ্চিতে শুয়ে শুয়ে তো আর জীবন কাটবে না।

—না না, গোলোক বিব্রত হয়ে বলল, আমি সে কথা বলছি না। আমি বলছি, জগতের সব লোককে এক রকম দেখ কেন? একজন তোমার উপর অন্যায় করেছে বলে যে সবাই তোমার উপর অন্যায় করবে, এটা তোমার ভুল ধারণা।

চারুলতা বলল, তা হয়তো হবে। তবে কি জানেন, দিন আনে দিন খায় যারা, তাদের যদি সামান্য টাকাও যদি মার যায় তবে খুব বিপদে পড়তে হয়। টাকা পয়সার ব্যাপারে আগে আমার এত নজর ছিল না। পরে ঠেকে ঠেকে এ-রকম হয়েছে। অনেক মার গেছে কিনা?

গোলোক বলল, আমি সে-কথা বলছি নে চারুলতা, তোমাকে আমি বোঝাতে পারছি নে কি বলতে চাইছি। আমি বলছিলাম কি, আচ্ছা চারুলতা, তোমাকে নিয়ে কেউ ঘর বাঁধতে চায় নি?

চারুলতা হাসতে হাসতে বলল, আমি কি চিরকাল এই বস্তিতেই আছি নাকি? এমন বাবুও পেয়েছিলাম, যিনি আমাকে কলেজের মেয়ে সাজিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। দু-মাস হোটেলে ছিলাম

আমরা। অবিশ্যি তিন বছর আগে আমার চেহারাটা আরও ভাল ছিল।

—না না, ও-রকম ঘর নয়, আমি সংসার পাতার কথা বলছি। গোলোক বলল, তোমাকে কেউ বিয়ে করতে চায় নি?

—ওমা, চাইবে না কেন? চারুলতার ঠোঁটে সেই পরিচিত হাসিটা উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। বলল, সোহাগের মানুষ কি কম এসেছে আমার! তবে বিয়ের কথা শুনলে আমি ভয় পাই। আমল দিই নে।

—কেন চারুলতা বিয়ে করা কি খারাপ?

—খারাপ কি ভাল তা জানি নে। তবে এটা দেখেছি যারা আমাকে বিয়ে করবে বলে লাফ ঝাঁপ করত, কত রকম মিষ্টি কথা আমায় বলত, তারাই সব থেকে বেশি টাকা মেরেছে। শুধু কথায় কি পেট ভরে? তাই এখন আমি বলি, বাবা ওসব ধোঁয়া ধোঁয়া কথা রাখো, কি চাও স্পষ্ট করে বলো, ফ্যালো কড়ি মাখো তেল।

—আচ্ছা, চারুলতা! গোলোক গম্ভীরভাবে বলল, এই তো তুমি এতদিন আমার এখানে আসছ, আমি কি তোমার খারাপ কিছু করেছি?

—ছি ছি, সে-কি কথা! চারুলতা জিভ কাটল। কিন্তু এসব কথা বলছেন কেন? আমার কাজকম্মে কি অসন্তুষ্ট হয়েছেন?

গোলোক বলল, না। তোমার প্রত্যেকটি কাজ আমার ভাল লাগে। (তোমাকেও আমার ভাল লাগে, খুব ভাল লাগে। তোমায় আমি ভালবাসি চারুলতা। বিশ্বাস কর তোমাকে আমি খুব ভালবাসি।) আমি কাজ সম্পর্কে কিছু বলছি নে। আচ্ছা চারুলতা—

গোলোক থেমে গেল। চারুলতা গোলোকের স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

—আমি তো তোমাকে শাড়ি কিনে দিয়েছি। তুমি কি বলতে চাও তার পিছনে আমার কোন মতলব আছে।

চারুলতা অম্লান বদনে বলে ফেলল, আপনার মনে কি আছে, আমি কি করে জানব ?

ঠিক এ-উত্তরটা যেন আশা করেনি গোলোক। ব্যথা পেল সে। চারুলতার কৃতজ্ঞতাবোধ নেই।

—না, কোন মতলব আমার নেই। ছিল না। তুমি এতদিন আছ, কোন অন্যায় সুযোগ তোমার কাছ থেকে নিই নি। যদি চিরকাল থাক, তখনও দেখবে, কোন অন্যায় তোমার উপর করব না।

গোলোক একটু উত্তেজিত হয়ে এতগুলো কথা বলল। একটু থামল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আমাকে তোমার কি মনে হয় চারুলতা ? আমার সম্পর্কে কি তোমার ধারণা ?

—কোন ধারণা নেই।

চারুলতার উত্তরে জড়তা নেই।

—কোন ধারণা নেই! গোলোক মনে মনে কেমন যেন অসহায় বোধ করল। ভালমন্দ কোন রকম ধারণাই নেই ?

চারুলতা বলল, আমি তো এসব কথা ভাবি নে।

—আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই চারুলতা। আবেগ দিয়ে বলে উঠল গোলোক। তোমাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধতে চাই। না, না, তুমি যা ভাবছ তা নয়। এ বিয়ে সত্যিকারের বিয়ে। তোমাকে নিয়ে আমি সুখী হতে চাই চারুলতা। তোমাকে সুখী করতে চাই।

গোলোক আবেগভরে চারুলতার দুখানা হাত চেপে ধরল। চারুলতা হাসতে লাগল। তার চোখ দুটো যেন বলতে লাগল, এ-খেলা এমন কিছু নতুন নয়।

হঠাৎ চারুলতা বলে উঠল, বেশ তো সাধটা মিটিয়ে ফেলুন। আজ থেকেই সুখী হবেন ?

গোলোক বলল, তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না। ভাবছ সেই

আগের বাবুদের মত আমিও ফাঁকা আওয়াজ করছি। কিন্তু আমি তাদের মত নই। তুমি বিশ্বাস করছ না, বুঝতে পারছি। কি করে তোমাকে বিশ্বাস করাব জানি নে।

চারুলতা বলল, আমাকে বিশ্বাস করাবার জন্য এত কষ্ট করার দরকার কি তার চেয়ে যা প্রাণ চায় করে ফেলুন, অনেক সহজে সে-কাজ হবে। আমাকে সহজেই পাওয়া যায়।

—না না চারুলতা, হতাশা-প্রাপ্ত গলায় গোলোক বলল, সে পাওয়া নয়। আমি কি চাই তুমি বুঝছ না। আমি তোমার সব চাই! শুধু স্থূল শরীরটাই নয়, তোমার মনটাও চাই।

চারুলতা হাসল আবার। স্পষ্টাস্পষ্টি বলল, কিন্তু মনের সঙ্গে তো শোয়া যায় না গোলোকবাবু?

আরও হতাশ হল গোলোক। তবু হাল ছাড়ল না। বলল, আমি আজ তোমাকে এ কথা বোঝাতে পারব না। কিন্তু একদিন তুমি বুঝবেই চারুলতা—

চারুলতা হঠাৎ বাধা দিল। বলল, আপনি আমাকে মডেল করবেন বলেছিলেন না?

—হ্যাঁ, কেন? বাধা পেয়ে আশ্চর্য হল গোলোক।

চারুলতা হাসতে হাসতে বলল, তার জন্য আলাদা টাকা দেবেন তো?

গোলোকের গালে যেন ঠাস করে এক চড় মারল চারুলতা। এই তবে ভেবেছে সে? চারুলতার মনটা সত্যিই খুব ছোট। মহত্তর কোন কিছু সেখানে রেখা ফেলতে পারে না। কখনও কি সেখানে দাগ ফেলতে পারবে না গোলোক?

গোলোক বলল, নিশ্চয়ই দেব চারুলতা। শুধু শুধু তোমাকে খাটাব কেন?

চারুলতার নগ্ন শরীরটা অজস্র রেখার ঢেউ তুলে গোলোকের বিছানায় পড়ে ছিল। মুখটা গোলোকের দিকে ঈষৎ বাঁকানো। গোলোক তন্ময় হয়ে পটের উপর রঙ লাগাচ্ছিল। রঙে রঙে আরেকটা চারুলতা সৃষ্টি হচ্ছিল। এ চারুলতা গোলোকের একান্ত আপন। অজস্র মুহূর্ত নিঃশব্দে ঝরে পড়েছিল তাদের সকলের ওপর। গোলোকের তুলির টানে দেখতে দেখতে দুটো চারুলতা আলাদা হয়ে গেল। পটের চারুলতা আসল চারুলতার দেহের রেখা ধরে ধরে এগোচ্ছিল! হঠাৎ পরিচিত নিশানা ছেড়ে দিয়ে ভাব-লোকের মোহানায় ঢুকে পড়ল। এর মুখে কোমলতা, এর ঠোঁটে তৃপ্তি, এর চোখে বিশ্বাস।

ছবিটা শেষ হতেই গোলোক উঠে পড়ল, চারুলতাও। সে অবাক হয়ে গেছে। ভাল করে ধরতে পারছে না, বুঝতে পারছে না। তবু কেমন ভাল লাগছে। গোলোক খুঁতখুঁত করছে। ভালই হয়েছে ছবিটা। তবু কোথাও যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে। কোথায়? ধরতে পারছে না। বারবার করে দেখল তবু ধরতে পারছে না। খচখচ করছে মনটা। ছবিটার সামনে চুপচাপ বসে রইল সে। কি যেন নেই? কি যেন একটা থাকা উচিত ছিল? না, ধরতে পারছে না। অস্থির হয়ে উঠল গোলোক। চারুলতা ওকে বিরক্ত করল না। নিজের মনে কাজ সেরে বাসায় চলে গেল।

ভাদ্রের স্বচ্ছ বিকেল পার হতেই চারুলতা আবার ফিরে এল। তখনও ঠায় বসে আছে গোলোক। প্রায় একভাবেই। চারুলতার সাড়া পেতেই সে তার দিকে একবার ফিরে চাইল। ভাল করে হয়তো দেখল না। চারুলতা এবারও তাকে বিরক্ত করল না। আপন কাজ যতটা নিঃশব্দে পারে সারতে লাগল। রান্নাবান্না করে

গোলোককে খেতে ডাকল। গোলোক খাবার চাপা দিয়ে রাখতে বলল। রাত বাড়তেই চারুলতা যাচ্ছি বলে বেরিয়ে গেল। গোলোক সাড়া দিল না। কিসের অভাব? কোথায় ফাঁক? তার মগজে খালি এই প্রশ্ন ঘুরছে। এমন সময় তার মগজে যেন বিদ্যুতের লহর খেলে গেল। টিউব থেকে রঙ বার করে ছবিটা মেরামত করতে লাগল।

চারুলতা সকাল বেলায় ফিরে এল। দেখে দরজা খোলা। ঘরে আলো জ্বলছে। রাতের খাবার ঢাকা দেওয়াই আছে। গোলোক এলোমেলো হয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। সারা শরীর যেন ক্লান্তিতে ডুবে আছে। খোলা জানালা দিয়ে আলো এসেছে। আলোটা ছবির উপর পড়েছে। ছবি দেখে চারুলতা চমকে উঠল। এ তো সম্পূর্ণ নতুন ছবি! তারই ছবি?

একটা মেয়ে শিথিল দেহ এলিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। পেটটা তার ঈষৎ স্ফীত। বুঝতে একটুও ভুল হয় না, সে মা হতে চলেছে। একটা হাত আলগোছে পেটের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সন্তানকে যেন পরম মমতাভরে স্পর্শ করেছে। সেই আবেশে মুখের উপর মাতৃত্বের কোমলতার ঢল নেমেছে। ঠোঁটে অপরিসীম তৃপ্তি। চোখে মধুর সম্ভাবনার প্রগাঢ় স্বপ্নের প্রলেপ। চারুলতা থ মেরে গেল। এই ছবি সে নয়, সে জানে। কিন্তু তবু তার মনে হল, এ যেন সে-ই। আগাগোড়া ছবিটায় কেমন পবিত্রতার ছোঁয়া লেগে রয়েছে। চারুলতা ভাবল, ছবির একটা মস্ত সুবিধে, তার জীবনে নোংরা লাগে না। ছবিখানার দিকে একমনে চেয়ে থাকতে থাকতে চারুলতার মনে হতে লাগল, সেও যেন এই ছবির মত পবিত্র। কোনদিন তার গায়ে কাদামাটি লাগে নি। তার ঠোঁটের পরিচিত হাসিটা মিলিয়ে গেল। মনের ভিতর কেমন যেন করছে। আনন্দ হচ্ছে। কান্না পাচ্ছে। কেমন যেন লাগছে। কেমন যেন মনে হচ্ছে এ-চারুলতা আসল নয়, ঐ পটের চারুলতাই আসল।

তার মনে পড়ল, তিন-চার বছর আগে তার পেটেও এক সন্তান

এসেছিল। তখনকার বাবু জানতে পেরে অনেক হাঙ্গামা করে সেটা নষ্ট করিয়ে দেয়। সেই সন্তান সম্পর্কে তার কোন মমতাও জন্মায় নি। কোন ধারণাও না। শুধু দিন কতক ভুগতে হয়েছিল বলেই সে কষ্ট পেয়েছিল। সেটা শারীরিক। এতদিন পরে সেই সন্তানই বুঝি পটের চারুলতার পেটে আশ্রয় নিয়েছে। হয়তো ভেবেছে মানুষ চারুলতার চেয়ে পটের চারুলতার আশ্রয়ই বেশি নিরাপদ। কেমন যেন করছে তার মন। একটা কি রকম আকুলি-বিকুলি ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইছে বুকের ভিতর থেকে। তার যেন আনন্দে হাসতে ইচ্ছে করছে। না, কান্না পাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি ছবির কাছ থেকে সরে গিয়ে হিটারে চায়ের জল চাপিয়ে দিল চারুলতা। আর তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

গোলোক যখন উঠল, দেখল চারুলতা চা তৈরী করে রোজকার মতই বসে আছে।

চারুলতাকে যদি পেতে তাহলে সুখী হতে, না গোলোক ?

সুখী ? নিশ্চয়ই সুখী হতাম। আমরা আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করতাম। আমার কামনা ছিল একটা স্বাভাবিক সংসারের আর চারুলতার ছিল সুস্থ এক সন্তানের। যে-সন্তানকে পিতৃপরিচয় নিয়ে লজ্জা পেতে, বিব্রত হতে হবে না, সেই রকম এক সন্তানের। শেষ পর্যন্ত আমি অসাধ্য সাধন করেছিলাম। চারুলতার মনের পরতে পরতে অবিশ্বাসের যে-কাঠিন্য ছিল, আমি তা সম্পূর্ণ দূর করে দিয়েছিলাম। ঘর বাঁধবার তীব্র কামনা চারুলতার মনেও জেগে উঠেছিল। কিন্তু মনোরমা সব ভেস্তে দিল। না, মনোরমার দোষ কি ?

এতো আমার পাপেরই শাস্তি।

পাপ পুণ্যে তুমি বিশ্বাস কর গোলোক ?

না, করি নে। কিংবা হয়তো করি। ঠিক জানি নে। তবুও এ-কথা মনে হয়েছে আমার। কেন, তাও জানি নে। আজ নয়, আবার মনোরমাকে পেয়ে যেদিন সংযম হারালাম, সেই তখনই একথা, এই পাপের ভয়, আমার মাথায় ঢুকেছে।

তা গোলোক অসাধ্য সাধনই করল। ধীরে ধীরে চারুলতার মনে স্বপ্নের চারা বুনে দিল সে। একটু একটু করে বিরাট পরিবর্তন সত্যিই সে চারুলতার ঘটাল। গোলোকের নিজের পরিবর্তন হয়েছে। সেই হতাশা নেই, অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো নেই। ছবি আঁকায় মন বসেছে। প্রেরণা পাচ্ছে। এই সময়ের আঁকাগুলো গোলোকের মতে তার শ্রেষ্ঠ রচনা। তার নিজের ভাল লাগে দিন সাতেক আগে যেখানা শেষ করেছে। নাম দিয়েছে 'যশোমতীর স্বপ্ন'। যশোদার সর্ব অঙ্গে মাতৃত্বের তীব্র কামনা ফুটে উঠেছে, ছবিখানার মূল ভাবটা এই। এ-ছবিতে চারুলতাকে মডেল করে নি গোলোক। তবু চারুলতার আকাঙ্ক্ষাটাই রূপ ধরেছে পটে।

গোলোক আরও খুশী হয় চারুলতার হাবভাব দেখে। মুখোশ খুলে আর একটা মূর্তি যেন বেরিয়ে এসেছে। গোলোক এখন প্রতি মুহূর্তে আশা করে এই বুঝি চারুলতা তাকে সুযোগ দেবে বিয়ের প্রস্তাবটা পাড়বার। সে ঠিক করল, কোন 'বাসনাই অপূর্ণ রাখবে না চারুলতার। অনুষ্ঠান করে বিয়ে করবে তাকে। নেমন্তন্ন করবে পরিচিত বন্ধু-বান্ধবকে। ঝর্ণাকে বলবে (ঠিকানা বার করতে অসুবিধে হবে না), মনোরমাকে বলবে। ঘটা করে ফুলশয্যার বাসর সাজাবে। যা-কিছু করবে, পাড়া জানিয়ে। চারুলতাকেও বলবে তার পরিচিত-জনাদের আমন্ত্রণ জানাতে। আসুক, যারা তার গত ইতিহাসের সাক্ষী, তারা আসুক, দেখুক, চারুলতা কেমন

ঘর পেতেছে, অস্থায়ী নয়, স্থায়ী। অসম্মানের ভিতের উপরে নয়, সম্মানের বনেদে। গোলোক প্রস্তুত। এখন চারুলতা ইঙ্গিত করলেই হয়।

চারুলতার চেহারাও যেন কিছু বদলে গেছে বলে গোলোকের মনে হয় আজকাল। মুখ-চোখের সেই সদাসতর্ক ভাবটা নেই। ঠোঁট থেকে 'সব-জানি' হাসিটাও বিদায় নিয়েছে। এখন চারুলতার সঙ্গে আর পাঁচটা নিতান্ত সাধারণ মেয়ের তফাৎ বোঝা হয়তো একটু মুশকিল। আপাত নজরে তাকে বেশ বোকাসোকাই ঠেকবে এখন। এ-মেয়েকে গোলোকের আর ভয় করার কিছু নেই, এটা সে বুঝে গেছে। তার অহমিকা তৃপ্ত হয়েছে।

চারুলতা আজকাল কি যেন ভাবে। কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অস্থির হয়ে উঠে। আগের মত বেশিক্ষণ থাকেও না। সে-ই এখন গোলোকের সামনে ভয়ে-ভয়ে থাকে। কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে সে গোলোকের দিকে চেয়ে থাকে মাঝে মাঝে। চারুলতার চোখে কেমন ঘোলাটে বিভ্রান্তি। যেন বলতে চায়, এ-ও কি হয়? স্বপ্ন কি সত্যিই সত্য হয়? চারুলতার ব্যক্তিত্ব যে অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়েছিল, আজ সেই ভিতে ভাঙন ধরেছে। নতুন জমিতে পা দেওয়া নিরাপদ কিনা, তাও বুঝতে পারছে না; আবার এ-যে মিথ্যে, প্রকাণ্ড ফাঁকি, সেটাও আগের মত জোর দিয়ে বলতে পারছে না। আগে যে-কথাগুলোকে তার ফাঁপা ফাঁপা বলে মনে হত, তার জোর যে অভিজ্ঞতার চাইতেও বেশি, সেটা দেখে অবাক হল চারুলতা। এখন তার মন এই কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলেই যেন খুশী হয়।

চারুলতার চেহারা এর মধ্যেই কেমন শুকিয়ে উঠেছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে। গোলোকের মনে হয় ও বোধহয় রাত্রে ঘুমোয় না। চারুলতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, ওকে বুকে টেনে নিয়ে আদরে আদরে ভয় ভাঙাবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হয় গোলোকের। চারুলতা

ভুগছে যে-যন্ত্রণায়, সেটা উপশম করে দেবার লোভটাও তুর্নিবার হয়ে ওঠে। সে নিজেও ভোগে। তবু সংযত করে নিজেকে। বহুদিন নিরুদ্দেশে জাহাজ চালিয়ে চালিয়ে গোলোক দিক-চক্রবালে এক ডাঙার সন্ধান পেয়ে, এখন মুহূর্তের তুর্বলতায় তার কাছ থেকে আর ভেসে যেতে চায় না। সতর্কভাবেই তার লক্ষ্যে সে পৌঁছতে চায়। পুড়ুক, জ্বলুক চারুলতা। খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে আসুক। গোলোকও বিশুদ্ধ হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করবে।

হঠাৎ চারুলতা বলল, তু দিনের ছুটি চাই।

—কেন? আঁতকে উঠল গোলোক।

চারুলতা বলল, কেন তা জানি নে। আমার ভাল লাগছে না। কি করবে, বুঝতে পারল না গোলোক। চারুলতা কি সরে পড়তে চায়? গোলোক চোখে অন্ধকার দেখল। না কি তাকে আরও পরীক্ষা করতে চায়? গোলোক নিজেকে সামলে নিল।

ধীরে ধীরে বলল, যেতে চাও বাধা দেব না চারু। কিন্তু ফিরে আসবে তো?

চারুলতা বলল, কি জানি, ঠিক বলতে পারছিনে। যদি ফিরি, মন ঠিক করেই ফিরব যাতে আর কখনও ফিরতে না হয়!

গোলোকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। তার মন বলল, তবে চারু ফিরবেই। তার একটা চুমু খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল কাকে চুমু খাবে গোলোক? চারুলতাকে? কোন্ অধিকারে? তাই ইচ্ছেটা দমন করল।

চারু জানতে চেয়েছিল কাজ করার লোক সে ঠিক করে দেবে কি না? গোলোক বলল, না। নিজের কাজ সে নিজেই করে নিতে পারবে এ তু দিন। লোক তার দরকার নেই।

সকালে ঘুম ভাঙতেই গোলোকের মনে হল আজ চারু আসবে। আসতেই হবে তাকে। চরম প্রত্যাশায় সে থরথর করে কেঁপে উঠল।

সে তাড়াতাড়ি উঠে হিটার জ্বালল, নিপুণ হাতে চা তৈরী করল। আজ সে আসবে। পরিপাটি করে দাড়ি কামাল গোলোক। আয়নায় চকচকে মুখখানা দেখে খুব খুশী হল সে। আজ চারু আসবে। পরশু থেকে এ-ঘরে পা পড়ে নি চারুর। সমস্ত বোঝা-পড়ার নিষ্পত্তি করে আজ সে আসবে। কালকের দিনটা যেন কাটতেই চায় নি গোলোকের। প্রতি মুহূর্তে সে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে এ দিনটা বুঝি জীবনে কাটবে না। মনে হয়েছে, এতগুলো ঘণ্টা এতগুলো মিনিট, পল-অনুপল একটা দিনের পক্ষে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। এই একটা দিনের মাল-মশলা দিয়ে অনায়াসে হাজার হাজার দিন গড়া যেত। এই অপব্যয়ে সে বেশ বিরক্তি বোধ করছিল। কাল কোনও উত্তেজনা ছিল না, কোনও আশা ছিল না, শুধু ক্লান্তি। হতাশার, নিঃসঙ্গতার একঘেয়েমি। স্বাদহীন বিড়ম্বনা।

আজ সে আসবে। দিনের রঙই বদলে গেছে! এক সময় গোলোক দেখল, সব কাজ সারা হয়ে গেছে তার। পরিপাটি করে চান করল গোলোক। কোথাও এক ছিটেফোঁটাও মালিন্য থাকতে সে দেবে না। চারু আসবে আজ। ধোয়া শরীর ধোয়া মন নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে গোলোক। দুপুর গড়িয়ে যেতেই দিনের ঢিলেমি আবার আরম্ভ হল। চারুলতা এল না। তবে কি সে আসবে না? আসবে, আসতেই হবে তাকে! গোলোকের বিশ্বাস একটুও টলল না।

কিন্তু, চারুলতা এল না। হুড়মুড় করে মনোরমা এসে ঢুকল। কেউ যেন তাকে তাড়া করেছে। সে হাঁফাচ্ছে। মুখখানা পরিশ্রমে টকটকে হয়ে উঠেছে। চোখে দারুণ উত্তেজনা। সেই মনোরমা। সে ঘরে ঢোকামাত্র ঘরময় সেই পরিচিত মাতাল-করা সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। তার ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল গোলোকের ঘ্রাণে, মগজে, প্রতিটি লোমকূপে। গোলোকের হৃদয়স্পন্দন দ্রুততর হল। সে ভয় পেল। সতর্ক হবার চেষ্টা করল।

হাঁফাতে হাঁফাতে নিচু গলায় মনোরমা বলল, পালিয়ে এলাম গোলোক, পালিয়ে যেতে এলাম। আর পারছি নে।

—কোথায় যাব? গোলোক প্রায় আর্তনাদ করে উঠল খাটটা শক্ত করে চেপে ধরল। এক্ষুণি যেন তাকে ছো মেরে তুলে নিয়ে যাবে মনোরমা।

মনোরমা দৃঢ়পায়ে এগিয়ে এল গোলোকের কাছে। একেবারে কাছে। তার শাড়িটা গোলোকের গায়ে ঠেকল। এই সেই পরিচিত দেহ! এখন তার নাগালের মধ্যে। এই দেহে কি দুর্নিবার আমন্ত্রণ। ঐ চোখের কুহকে কি অনিবার্য আকর্ষণ। গোলোকের দেহের গ্রন্থিগুলো দ্রুত ঢিলে হয়ে আসছে। যে-সব বাঁধনে তার অবয়বটা জোড়া লেগে আছে, পটপট করে যেন তা ছিঁড়ে যাবে। তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অণু-পরমাণু যেন খুলে খুলে আলাদা হয়ে পড়েছে, তারপর প্রচণ্ড চৌম্বক টানে সবগুলো দ্রুতবেগে আছড়ে পড়তে চাইছে মনোরমার উপর।

—ভুল করেছি গোলোক, তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে ভুল করেছি।

(ভালই করেছিলে মনোরমা, তোমার ভুলকে ধন্যবাদ দিই। তাই তো আমি চারুলতাকে পেয়েছি।)

—কথা বলছ না কেন গোলোক, এই ছ্যাখ সেই ভুল শোধরাতে আজ আমি বেরিয়ে পড়েছি।

(বাড়ি ফিরে যাও মনোরমা আজ আর আমি তোমার নই।)

—আজ আমি তোমার গোলোক।

(আজ আমি চারুর, মনোরমা।)

—সেই আগের মতই তোমার, কায়মনে তোমার।

(তোমার স্বামীকে তুমি ভালবাসো, মনোরমা। আমি চারুকে।)

—আমি অনেক যুঝেছি গোলোক, আর পারি নে। পারি নে। পারি নে। সেদিন জীবনের ক্ষুধার চেয়ে স্থায়িত্বকে, নিরাপত্তাকে বড় বলে মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম তাতেই সুখ। ভেবেছিলাম

স্বামীর চোখ একদিন না একদিন পড়বেই। এই চারমাস চেষ্টার ক্রুটি করি নি। কিন্তু একটুও টলাতে পারি নি। তার সদা-সর্বদা ভয়, আবার যদি অসুখ করে আমার। শেষে মরিয়া হয়ে একদিন সব বলে দিলাম। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা খোলাখুলি বলে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। সেই বিকালে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। যখন শুনল, না, বাচ্চা-টাচ্চা হবার সম্ভাবনা নেই, তখন নিশ্চিন্ত হল। বাড়ি এসে ধমক দিল। না গোলোক, একটু ঈর্ষা জাগে নি ওর মনে। সেই সেদিন ভারি সুটকেসটা তুলেছিলাম বলে যেভাবে ধমকেছিল, এই-দিনও তেমনিভাবেই ধমকাল। বলল, এমন কিছু করো না রমা, যাতে আবার অসুখটা ধরে। তবে, আমি কী সারলাম গোলোক, কি এমন স্বাভাবিক হলাম। আমি যে সুস্থ হয়েছি, সেরে গিয়েছি, স্বাভাবিক হয়েছি, এ ওরা কেউ বিশ্বাস করে না। আমি মানুষের মত বাঁচতে চাই, গোলোক। রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের দাবী মিটিয়েই বাঁচতে চাই। চিরকাল শো-কেসে তোলা মোমের পুতুল হয়ে থাকতে চাই নে—

মনোরমার চোখে জল এসে গেল। সমবেদনায় গোলোকের মন টনটন করে উঠল। এ-ব্যথা গোলোক বোঝে। তার শরীরও যে দীর্ণ। গোলোক কোনও কথা লুকোয় নি চারুলতার কাছে। তাই কি চারু পিছিয়ে গেল? সেও ভয় পেল নাকি?

গোলোক মনোরমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ওর দুখানা হাত নিজের হাতে নিতেই অনিবার্য বিপর্যয় ঘটে গেল। ধীরে ধীরে তার চেতনা যখন ফিরে এল, তখন দেখল তার বুকে মুখ গুঁজে মনোরমার শিথিল দেহ পরম নির্ভয়ে পড়ে আছে।

এ কী! এ কী করল সে! সপাং করে গোলোককে তার বিবেক যেন চাবুক মারল। তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ার চেষ্টা করল। পারল না। মনোরমার দেহটা তাকে যেন টিপে ধরে থাকল। গোলোক অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করল।

তারপর কি হল, গোলোক ? বাকিটুকু তাড়াতাড়ি শেষ কর। রাত আর বেশি নেই।

হ্যাঁ, আর বেশি বলবারও নেই। খুব ভাল করে মনেও নেই সব। শুধু মনে আছে, মনোরমার দেহের নিচে চাপা পড়ে আমি অনুশোচনায় জ্বলে-পুড়ে মরছিলাম। এ-কথাটা এখন আমার নিজের কাছেই ন্যাকামির মত লাগছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার যে-অনুশোচনা হচ্ছিল, তাতে ন্যাকামির লেশমাত্রও ছিল না। আমার অন্তর তখন বলছিল, পরস্ত্রীর (আশ্চর্য ! এই প্রথম বোধ করলাম মনোরমা পরস্ত্রী, আমার কেউ নয় ) সঙ্গে এই ব্যবহার অবৈধ, অন্যায় এবং পাপ ( চট করে 'পাপ' কথাটা মনে উদয় হল )।

বেলা যে গড়িয়ে গিয়েছে সে খেয়ালই ছিল না। খেয়ালটা হল, চারুলতা ঢুকতে। চারুলতাকে দেখেই আমার চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কে যেন আমাকে অন্ধকারের অতল গহ্বরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি ঘুরতে ঘুরতে নিরুদ্দেশের গভীরে তলিয়ে যেতে লাগলাম। প্রাণপণ চেষ্টায় মনোরমাকে ঠেলে ফেলে উঠে পড়লাম। মুহূর্তে মনোরমার তৃপ্তির ঘোর কেটে গেল। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ধড়মড় করে উঠে বেশবাস সামলাতে লাগল। চারুলতা স্থির দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। তার ঠোঁটে অনেকদিন পরে সেই 'সব-জানি' হাসিটা অনেক তীব্রতা নিয়ে ফুঠে উঠল, দেখলাম। এতদিনে যেন চারুলতা হিসেবটা মেলাতে পারল। কয়েক মুহূর্তেই নতুন চারু, পুরনো চারুর মধ্যে মিলিয়ে গেল। তবু আমার মনে হতে লাগল, ও যেন অন্য মানুষ। দেহপশারিণী নয়, এক সম্রাজ্ঞী। আমি যেন ওর মনিব নই, ছিঁচকে চোর একটা। ধরা পড়ে মুখ নিচু করে বসে আছি। মনোরমার অবস্থা যে আরও খারাপ, সে তো না বললেও চলে। অবশ্য সে তখন কি করছিল কি ভাবে সামাল দিচ্ছিল নিজেকে আমি দেখি নি। একবার মনোরমা যখন যাবার জন্য উঠল তখন চারুকে বলতে শুনলাম, এখনই উঠছেন কি, এক কাপ চা খেয়ে

যান। তাছাড়া এ-ভাবে পথে বেরোয় নাকি, মুখখানা আয়না দিয়ে দেখুন তো। যান, কলঘর থেকে ছিরি ফিরিয়ে আসুন।

মনোরমা বাথরুমে গিয়েছিল কিনা, চা খেয়েছিল কিনা জানি না। মাথা তুলতে পারি নি। আরেকবার চারুলতাকে বলতে শুনলাম, ( তখনই বোধহয় মনোরমা চলে গেল ) ও আপনার সঙ্গে বাবুর বুঝি টাকা-পয়সার লেন-দেন নেই। আপনারা, ভদ্দর ঘরের মেয়েরাই তো এইভাবে বাজারটা নষ্ট করে দিচ্ছেন।

মনোরমার কিসের প্রাণ জানি নে। তবু সে মরল না। আশ্চর্য! লাঠি-খাওয়া কুত্তির মতই ( আমার বোধ হয় এ-কথাটা বলা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু বলে বেশ সুখ পাচ্ছি কিন্তু ) মনোরমা যে সেদিন চলে গিয়েছিল, সেটা আন্দাজ করতে পারি।

একটু পরে চারুলতা বলল, এবার আমিও যাই। পাওনা চুকিয়ে দিন।

এত সহজে নিষ্কৃতি পাব ভাবিনি। আমি আর চারুলতাকে সহ্য করতে পারছিলাম না। হাত দিয়ে ড্রয়ারটা দেখিয়ে দিলাম। টাকা গুণে নিয়ে চারুলতা বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে সব খেলা সাঙ্গ হল। আঃ, অদ্ভুত আরাম লাগতে লাগল। যেন মুক্তি পেয়ে গেছি। আমার মনে কেউ নেই আর। মনোরমা নেই। চারুলতা নেই। কয়লা তুলে নেবার পর খাদের শূন্যতা যেমন বালি ঢেলে ঢেলে ভর্তি করা হয়, আমার মন থেকেও তেমনি মনোরমা আর চারুলতা বেরিয়ে যাবার পর মনের শূন্য ভরে উঠল ক্লান্তি আর অবসাদে। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

বেশ টেনে একটা ঘুম দিয়েছিল গোলোক। ভোর হলো, আলো ফুটল, বেলা বাড়ল। তখনও গোলোক ঘুমুচ্ছে। দরজায় খট খট আওয়াজ হলো, চারুলতাই এসেছে। চমকে ঘুম ভাঙল গোলোকের। চারু! গোলোকের মনে হলো, চারুলতাই এসেছে। গোলোক বিব্রত হলো। আবার খুশীও। তৈরী হলো, কঠিনতর এক সংগ্রামের

মহড়া নিতে। চারু ফিরে এসেছিল, গোলোকের মনে পড়ল। তার মানে, সে ধরা দিতে এসেছিল সংসারের নিবিড় বন্ধনে। গোলোক মুহূর্তের দুর্বলতায় চারুকে আবার ঠেলে ফেলে দিয়েছে অবিশ্বাসের অকূল দরিয়ায়। জগতে ভাল কিছু ঘটে না, এই বিশ্বাস নিয়েই কাল চারু ফিরে গিয়েছিল। অভিযোগও করে নি, হা-হুতাশও না। এতো তার জানাই ছিল। এমনই হয়। হয়ে থাকে। মাঝখানে গোলোকের মিষ্টি কথার ছবিতে নিজেকেই ভুল বুঝতে শুরু করেছিল চারুলতা। এতকাল যে-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চারুলতা জীবন কাটিয়ে এল, তা মিথ্যে, সত্য শুধু গোলোকের আঁকা ছবি! কথার ফুলঝুরিতে এতদিন তার চোখে যে-সব ছবি ফুটিয়ে তুলেছে গোলোক, সত্য শুধু তাই! গোলোক জানে চারুলতার মনে এসব কথাই উঁকিঝুঁকি মারছে। বন্ধ দরজার ওপিঠে দাঁড়িয়ে এখনও নিশ্চয়ই এসব কথাই ভাবছে চারুলতা। গোলোক যে-বিশ্বাসের ভিত কাল ভেঙে দিয়েছে, তা কি আবার কখনও গড়তে পারবে নতুন করে; মনে হয় না। না পারুক, হাল ছাড়বে না গোলোক, ভাঙা ভিতের ওপরেই ভালবাসার ইমারৎ আবার সে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে। এই চেষ্টাতে সারাটা জীবনই যদি তার খরচ হয়ে যায়, যাক। সে দুর্বল, তাই সে ভুল করেছে। তা বলে চারুর প্রতি তার ভালবাসা মিথ্যে হয়ে যায় নি। এখনও না। সেই ভালবাসাই তাকে জোর দেবে, সেই জোরেই এগিয়ে যাবে গোলোক। আর ভুল নয়। আর লক্ষ্য হারাবে না গোলোক। এতক্ষণে সে সাহস পেল। খট খট খট। দরজার কড়ায় অসহিষ্ণু শব্দ উঠল। গোলোকের মনে হলো, চারুলতা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তবে কি সে বোঝাপড়াই করতে এসেছে? আসুক না! আজ আর ভয় করবে না গোলোক। কাল সে চোরের মত ছিল, আজ সে মানুষের মত দরজা খুলে দাঁড়াবে চারুলতার সামনে।

দরজার খিল খুলতে আদৌ বিব্রত বোধ করল না সে। একটুও

হাত কাঁপল না তার। তবুও সে চমকে গেল পুলিসের লোক দেখে। একজন অফিসার, আর একজন সেপাই।

অফিসারটি নমস্কার করে বললেন, আপনিই গোলোকবাবু?

গোলোক বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাকে কি প্রয়োজন?

অফিসারটি বললেন, প্রয়োজন খুবই জরুরী। কিন্তু তার আগে জানা দরকার আপনার পুরো নামটি কি?

—গোলোক মজুমদার।

—চারুলতা নামে কোনও মেয়েকে চিনতেন?

সাংঘাতিক আশঙ্কায় গোলোকের বুক দুরু দুরু করে উঠলো। প্রায় চেঁচিয়েই উঠলো, কি হয়েছে চারুলতার; কি করেছে সে! মারা যায় নি তো!

—আজ্ঞে ঠিক তাই। আত্মহত্যা করেছে। মানে, আমার সেই রকমই সন্দেহ। কিন্তু দেখছি, আপনি ব্যাপারটা জানেন।

গোলোকের কানে পুলিস অফিসারের কথা ভাল করে ঢোকে নি। তার মনে প্রবল ঝড় বইছিল তখন। হ্যাঁ সে জানে। না, জানে না। তার সঙ্গে পরামর্শ করে মরে নি চারুলতা। তবু, এখন তার মনে হচ্ছে যেন, এটা নিতান্ত অজানাও নয়। কিন্তু আগে এটা অনুমান করতে পারে নি কেন গোলোক? কালকেই কেন এই সন্দেহ হয় নি তার! কেন সে চারুলতাকে যেতে দিল অমন করে। গোলোকের অন্তরে কেউ যেন ধারাল ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ ছটফট করল গোলোক। তারপর তার মন ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে পড়ল।

থানায় গিয়েও তার এ জড়ত্ব পুরোপুরি কাটল না। দারোগার জেরায় চারুলতা সম্পর্কে যা জানত সবই বলল। ঝিগিরি করতে এসেছিল চারুলতা! গেরস্থালির সব কাজই করতো, কিছুদিন মডেলও হয়েছিল গোলোকের। হ্যাঁ, গোলোক আর্টিস্ট। চারুলতা তার প্রেরণার উৎস ছিল, এ কথা সত্য, সে গভীরভাবে

ভালবেসেছিল চারুলতাকে। যে-ভালবাসা মনকে মহৎ করে, অন্তরকে বিশুদ্ধ করে, যে-ভালবাসা দেহের দাহ শীতল করে, সেই ভালবাসা জন্মেছিল গোলোকের মনে। একথা সত্য, পরম সত্য। কি জানি কেন মনোরমার প্রসঙ্গ একেবারেই তুলল না গোলোক, হয়তো ভাবল, মনোরমার ভূমিকা প্রকাশ পেলে চারুলতার মৃত্যু মহান হয়ে উঠবে না। (চারুলতা মনোরমার কাছে হেরে গেছে। সেই পরাজয় ভুলতেই হয়তো জীবন দিয়েছে। শুধু শুধু আর এক সংসারে আগুন জ্বলবে। কাজ কি? গোলোক নিজের কাঁধেই সব দোষ চাপাল। সে-ই তো দোষী। তার পাপেই মরেছে চারুলতা।)

গোলোক পুলিসের কাছ থেকে শুনলে, এক শিশি ক্লোরোফরম খেয়ে চারুলতা মরেছে। ভোর প্রায় চারটের সময়। চারুলতার লাশটা দেখে পুলিসের ধারণা হয়েছে সেই রকমই। টকটকে লালপেড়ে সিল্কের শাড়ি পরেছিল চারুলতা। আনকোরা নতুন সায়া, নতুন বডিস, নতুন ব্লাউজ, সব সেই দিনই কেনা। ক্যাশমেমো পাওয়া গিয়েছে তার ঘরে। (হ্যাঁ, চারুলতার পাওনা টাকা সেইদিনই গোলোকের কাছ থেকে সে মিটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।) হাতে শাঁখা ছিল তার, সিঁথেয় সিঁদুর। দেখে মনে হয় সেইদিনই পরা, যেন নতুন কনে। সদ্য বাসর থেকে উঠে এসেছে। চারুলতা ক্লোরোফরম কোথায় পেল, পুলিস সে-সন্ধান পায় নি। গোলোকের সামনেই লাশ-কাটা ঘর থেকে ময়না তদন্তের রিপোর্ট এল।

দারোগাবাবু রিপোর্ট দেখে বললেন, আত্মহত্যা। যান মশাই বাড়ী যান। আপনাকে আর দরকার নেই।

গোলোক ফ্যাল ফ্যাল করে দারোগাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

দারোগাবাবু বললেন, পেট-ফেটও তো বাধে নি, ক্লিয়ার রিপোর্ট, তবে মরতে গেল কেন, জানেন কিছু?

গোলোক সে কথার জবাব দিল না। চুপ করে বসে রইলো।

আর কতক্ষণ বসে থাকবে গোলোক, শিশিটা সামনে রেখে? সময় হয়েছে, ছিপিটা এবারে খোল। চারটে বাজে। এত থাকতে তুমি ক্লোরোফরম্ আনলে কেন?

চারুলতা যে তাই খেয়েছিল। আমি তো জানি, সে কিছুদিন নার্সগিরি করেছে। এসব বিষয় সে আমার থেকে অনেক বেশী জানে। তাই, জ্বালা জুড়োতে সে যখন ক্লোরোফরম্ খেয়েছে, তখন আমিই বা তার অনুসরণ করবো না কেন? আমারও তো ওই একই জ্বালা।

এতক্ষণে চারটে বাজল। সে এই সময়েই বিষ খেয়েছিল! গোলোক শেষবারের মত তার কথাই ভাবল। ধীরে ধীরে শিশিটা হাতে তুলে নিল, ছিপিটা খুলতে খুলতে আলতো করে ক্লোরোফরমের গন্ধটা একবার শুঁকলো। বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাগল। খেতেও কি এমনি মিষ্টি? উত্তরের অপেক্ষা না করেই গোলোক শিশিটা উপুড় করে তরল পদার্থের সবটুকু গলায় ঢেলে দিল। তার দেহটা একবার থর থর করে কেঁপে উঠল, একটু পরেই স্থির হয়ে গেল। আরও পরে শীতল। আর কোথাও দাহের লেশমাত্র নেই।

গোলোক এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি!